দাম্পত্যের ছন্দপতন

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি

সাইদ মুবারক

দাম্পত্যের ছন্দপতন

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি
সাইয়েদ মুবারক

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ওপর।

দাম্পত্য—এক অন্যরকম জগৎ। যে জগতে দুটো মানুষ—দুজনই নতুন। এ নতুন জগতের বাঁকে-বাঁকে অপেক্ষা করে আনন্দ-বেদনার কতশত গল্প! সময়ের সাথে দুজনে মিলে আবিষ্কার করে সেসব। আবিষ্কার করে এ জগতের নানা রূপ-রসায়ন। অবশ্য দাম্পত্যের জটিল রসায়নে মাথা ঘোরেনি এমন দম্পতি খুব কমই পাওয়া যাবে। মহান রব নারী-পুরুষ দুজনকে সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো প্রকৃতিতে। এই ভিন্ন প্রকৃতির মহিমায় তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে জীবনভর পাশে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো অবস্থা এমনও দাঁড়ায়, দুজনের ভাষা দুজনের কাছে দুর্বোধ্য লাগে। শুরু হয় নানা বিপত্তি। হন্যে হয়ে আমরা সমাধান খুঁজে ফিরি।

কিন্তু কী করে সমাধান পাব? ছাত্রজীবনে জগৎসংসারের নানা বিদ্যে আমাদের ধরে-বেঁধে খাইয়ে দেওয়া হলেও পরিবার-সংসারের কিছুই তেমন শেখানো হয় না। এজন্য আমাদের আলাদা করে সময় দিতে হবে। দাম্পত্য ও প্যারেন্টিং নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে। এই প্রস্তুতির শুরু হওয়া উচিত বিয়েরও আগে থেকে।

দাম্পত্য বিষয়ক এটি আমার অনূদিত দ্বিতীয় বই। পরিবার বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা আমাদের জানা প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষাগুলো মানতে পারলে যেকোনো পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইতে বাধ্য। তাঁর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধায় তাই তো বুকটা ভরে ওঠে। কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে সেই রবের প্রতি যিনি আমাদের না শেখালে, না হেদায়াত দিলে জীবনটা হতো ভয়ংকর নরকের মতো! আল্লাহ ﷻ ও

তাঁর রসূলে ﷺ-এর শেখানো পথে চললে জীবনটা কত সহজ হয়ে যায়! আর এমনটাই তো হবার কথা! মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কে ভালো জানবে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে?

অনুবাদ করতে গিয়ে একটা বই বারবার পড়া লাগে। এতে বইটা ভালোভাবে আত্মস্থ হয়ে যায়। এ কারণে পছন্দের বিষয়ে বই অনুবাদে আনন্দ পাই। ভালো লাগে লেখালেখি নিয়ে আড্ডা দিতে। এই বইটি অনুবাদে বন্ধু জাহিদের নাম প্রথমেই আসবে। অনুবাদ-আড্ডায় কেটেছে আমাদের অনেকগুলো সন্ধ্যা। তার সাহায্য-পরামর্শে বইটি পেয়েছে অন্য মাত্রা। আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বন্ধুপ্রতিম মহিউদ্দীন রূপম ভাইয়ের কথা না বললে অন্যায় হবে। অনুবাদচর্চায় ভাইয়ের হাতের কথা সুবিদিত! সময়ে-অসময়ে বহুবার বিরক্ত করেছি ভাইকে। সব সময় হাসিমুখে তাকে সাথে পেয়েছি। তাকেও আল্লাহ ﷻ উত্তম প্রতিদান দিন।

পাঠকের কাছে দু'আর দরখাস্ত রইল আমার মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তানের জন্য, যাদের সাথে হাতে-কলমে শিখেছি—এখনো শিখছি পরিবারজীবনের খুঁটিনাটি। পরিশেষে ওয়াফি পাবলিকেশনসহ এই বইয়ের সাথে জড়িত সকলের জন্য দু'আর আর্জি রইল। আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের এই কাজটি তাঁর দ্বীনের খেদমত হিসেবে কবুল করেন!

আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ
ayatnawaz9@gmail.com
২৩ সফর, ১৪৪২ হিজরি

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই আশ্রয় চাই; তাঁরই কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের নাফসের সকল অনিষ্টতা ও সকল কৃতকর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ ﷻ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ কাউকে সঠিক পথের দিশা না দিলে তাকে কেউ তা দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া সত্যিকার উপাস্য আর কেউ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"হে মানুষ, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন, আর ওই দুজন থেকেই অনেক নর-নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে (নিজ নিজ অধিকার) চেয়ে থাকো। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন।"[২]

---

১. আল-কুরআন, ০৩ : ১০২
২. আল-কুরআন, ০৪ : ০১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজগুলো সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করল।"[১]

নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশনাই হলো সবচেয়ে সঠিক পথনির্দেশ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দ্বীনের মাঝে নব-উদ্ভাবিত বিষয়গুলো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত বিষয় হলো বিদ'আহ, আর প্রত্যেক বিদ'আহই পথভ্রষ্টতা; আর সব পথভ্রষ্টতার শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম।

সুখী সংসার মানুষের জন্য শান্তির নীড়। সহমর্মিতা, সমবেদনা আর ভালোবাসায় এ নীড় থাকে ভরপুর—আর মতভেদ-অশান্তি যতটা সম্ভব কম থাকে। সুখী সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একদমই সমস্যা থাকে না—এমন নয়; কিছু মতভেদ তো থাকেই। পার্থক্য হলো—কিছু দম্পতি জানেন এসব মতভেদ তৈরি হলে কীভাবে সামাল দিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। আর কিছু দম্পতি এসব কৌশল একেবারেই জানেন না।

অজ্ঞতাবশত তারা একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন—সামান্য মতভেদ থেকে বিশাল যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেন। শুরুর দিকে এ খণ্ডযুদ্ধগুলো সন্ধির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। একপর্যায়ে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকে, আর সন্ধির বদলে জয়-পরাজয় মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কেউ কি জিততে পারে? একসময় দুজনেই হেরে যায় তালাকের কাছে—ভেঙে ভেঙে খানখান হয় একটি পরিবার। খুব দুঃখের সাথে এখন অনেক ডিভোর্স হতে দেখা যাচ্ছে, যার কারণ মানিয়ে চলায় ব্যর্থতা নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর একজন বা উভয়ের তুচ্ছ মতভেদকে অনেক বড় করে তোলা। ইসলাম সুখী দাম্পত্য জীবনের পথ দেখিয়েছে। যে দম্পতি ইসলামের শিক্ষার ওপর

১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৭০-৭১

যত বেশি অবিচল থাকে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তারা তত সুখী জীবনযাপন করে।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এ বইয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে সুখী দাম্পত্য জীবনের শক্ত ভিত গড়ে তোলা যায়—কোথা থেকে আসে নানা সমস্যার ঝড়-ঝাপটা, সেসবের মাঝে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, এগিয়ে যেতে হয়। আমি আল্লাহর কাছে সরল পথে চলার হেদায়াত চাই। সকল প্রশংসা তো সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার জন্যই!

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি
শিরবাস, ফাস্কুর, দিমইয়াত, মিশর।
৫ মার্চ, ১৯৯৬

সূচিপত্র

[১ম অংশ]

১৯ | প্রথম অধ্যায়

৬৭ | দ্বিতীয় অধ্যায়

১২৫ | চতুর্থ অধ্যায়

১৩৭ | পঞ্চম অধ্যায়

১৪৯ | ষষ্ঠ অধ্যায়

১৬১ | সপ্তম অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি
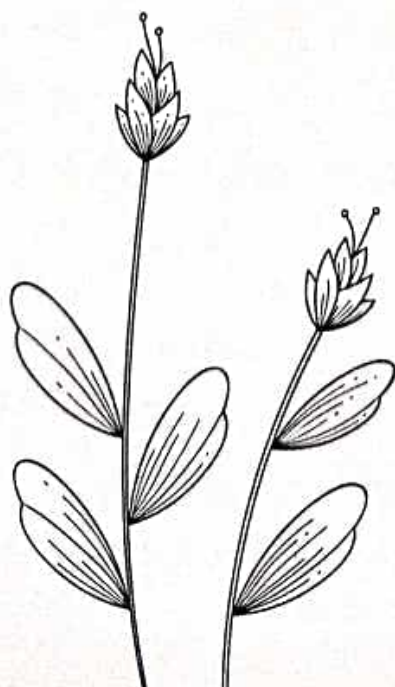
সুখী দাম্পত্যের ভিত্তি

বিয়ের সময় কখনো কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কেন বিয়ে করছি?' বিয়ে কি নিছকই দুটো দেহ-মনের মিলন? চলুন, ফিরে যাই ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। জেনে নিই, ইসলাম কীভাবে দেখে বিয়েকে।

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।"[১]

ইসলামে বিয়ের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুখী বন্ধন গড়ে তোলা—যেন দুটো প্রাণ একে অপরের মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পায়। এজন্য সুখী দাম্পত্য বলতে কী বোঝায়, কীভাবে তা অর্জন করতে হয়, ধরে রাখতে হয়—এসবই আমাদের জানা প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ ﷺ এ সবকিছুই আমাদের বিশদভাবে শিখিয়ে গিয়েছেন।

সুখী সংসারের অনেক নিয়ামক রয়েছে। সুখ কখনোই শুধু শারীরিক সম্পর্ক দিয়ে লাভ করা যায় না। হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ একান্ত মুহূর্তগুলো সুখী সম্পর্ক গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাচ্ছেন, অর্থনৈতিকভাবে তারা কতটা সন্তুষ্ট—এসবও খেয়াল রাখা দরকার। উভয়ের ব্যক্তিত্বে মিল, ধর্মীয় বিষয়গুলোতে একই দৃষ্টিভঙ্গি—এসবও সম্পর্কের ওপর বেশ ভালো প্রভাব রাখে।

সুখী সংসারের মজবুত ভিত গড়ার পথ ইসলাম আমাদের বাতলে দিয়েছে, শিখিয়েছে নানা মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলো মেনে চললে দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য নিজে থেকেই চলে আসে। এ রকম কিছু মূলনীতি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

---

১. আল-কুরআন, ৩০ : ২১

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'চারটি বিষয় খেয়াল রেখে কোনো মেয়েকে বিয়ে কোরো—সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারি। (এর মাঝে) দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও, তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক[১]।'[২]

এই হাদিসের শিক্ষা হলো, সব সম্পর্কে তো বটেই, বিশেষভাবে বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত দ্বীনদারিকে অন্য সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। জীবনসঙ্গী পছন্দে দ্বীনদারি হতে হবে প্রধান মাপকাঠি।

এর অর্থ এই নয় যে, নারীর অন্যান্য গুণগুলো হেলাফেলার। কোনো নারী ধনী হলে স্বামী তার সম্মতিতে সে সম্পদ নিজের কাজে লাগাতে পারেন। স্ত্রীর সৌন্দর্য স্বামীকে শয়তানের প্রলোভন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এজন্য বলা আছে, যদি দুজন নারী দ্বীনদারিতে সমমাপের হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অধিক সুন্দরী যে জন তাকে পছন্দ করা যায়। কিন্তু অসুন্দরী দ্বীনদার মহিলার পরিবর্তে বেদ্বীনদার সুন্দরীকে পছন্দ করা অনুচিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মেয়েদের বিয়ে কোরো না। এ সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। হয়তো এ সম্পদ তাদের অপকর্মের কারণ হবে। বরং দ্বীনদারি দেখে তাদের বিয়ে করো। চ্যাপ্টা নাকের কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম যদি সে দ্বীনদার হয়।'[৩]

অবশ্য বর্তমানে সচেতন দ্বীনদার মানুষেরা দ্বীনদার জীবনসঙ্গীই খুঁজে থাকেন। সমস্যা তৈরি হয়, যখন দ্বীনদার নয় এমন দুজন বিয়ে করে—পরে তাদের একজন সত্যপথের দিশা পায়, অন্যজন আগের অজ্ঞতার মাঝেই রয়ে যায়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আসলে দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থতার পেছনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈপরীত্য যতটা না দায়ী, তারচেয়ে বেশি দায়ী তাদের ব্যক্তিত্ব ও অভ্যাসের সাংঘর্ষিক দিকগুলো।

---

১. এর অর্থ হলো, তাহলে তুমি সফলকাম হবে। تَرِبَتْ يَدَاكَ - এই কথাটি মানুষকে উৎসাহ দিতে বলা হয়।
২. বুখারী (৫০৯০), মুসলিম (১৪৬৬), আবু দাউদ (২০৩২), নাসাঈ (৬/৬৮), ইবনে মাজাহ (১৮৫৮), দারিমি (২১৭০), আহমাদ (২/৪২৮), বায়হাকী (৭/৭৯), ইবনে হিব্বান (৪০২৫, ৪০২৬)
৩. ইবনে মাজাহ (১৮৫৯), বায়হাকী (৭/৮০), ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণিত। আলবানি তার আদ-দ্বয়িফাতে হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।

এজন্য বিয়ের আগে দুপক্ষের উচিত সম্ভাব্য সঙ্গীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। উভয় পরিবারের দায়িত্ব হলো সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক তথ্য খোলাখুলি জানানো। ভেবে দেখুন, বিয়ের পর সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার চেয়ে বিয়ের আগেই সম্পর্ক থেমে যাওয়া ভালো নয় কি?

মেয়ের পরিবার যেমন তার দোষ-গুণ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে, তেমনি ছেলের পরিবারও তাদের সন্তান সম্পর্কে ভালো জানে। পরিবারের মেয়ে সদস্যরা তাদের মেয়ে সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে। তাই ছেলের পরিবারের কোনো মহিলা কনের মা বা বোনের সাথে খুব সহজেই তার ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ করতে পারে। একই কথা ছেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ছেলের সম্পর্কে তার বাবা বা ভাই সবচেয়ে ভালো জানবেন। এভাবে সরাসরি কোনো সম্পর্কে না জড়িয়ে খুব সহজেই একে অপরের সম্পর্কে জানা সম্ভব।

বিয়ের কথা ঠিক হওয়ার পর অনেকেই একটি বড় ভুল করে। মনে করে, বিয়ের আগে ডেটিং বা দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানা যাবে। প্রথমত এটা ইসলাম পরিপন্থী; দ্বিতীয়ত এটা অনেক বড় ভুল ধারণা। দুবছর প্রেম করার পরেও খুব সামান্যই একে অপরের দুর্বলতা ও দোষ সম্পর্কে জানা সম্ভব। এ পুরোটা সময় দুজনেই একে অপরের কাছে নিজেকে সর্বোত্তমরূপে দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিয়ের পর তারা সঙ্গীর আসল রূপ আবিষ্কার করে। এ কারণে পশ্চিমা দেশগুলোতে ডিভোর্সের হার অনেক বেশি।

ইসলাম ছেলেকে কিছু শর্তসাপেক্ষে বিয়ের আগে তার সম্ভাব্য স্ত্রীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার অনুমতি দিয়েছে। একবার এক সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন, তিনি এক আনসারী নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নবীজি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছ?" সাহাবী জবাব দিলেন, "না।" তখন তিনি ﷺ তাকে বললেন, "যাও, তাকে একনজর দেখে নাও। কারণ, আনসারদের চোখে কিছু সমস্যা থাকে।"[১]

"আনসারদের চোখে কিছু সমস্যা থাকে" আলিমগণ এ কথার বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, আনসাররা ছিলেন ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন। অন্যদের মতে, তাদের চোখ

১. মুসলিম (১৪২৪), আহমাদ (২/৭৬, ২৯৯) এবং ইবনে হিব্বান (৪০৩০), আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

ছোট ছোট ছিল। আরেক দল আলেমের মতে, তাদের চোখ ছিল নীলাভ। তবে আবু আওয়ানার মুসতাখরাজে বর্ণিত এই হাদিসের শেষে অতিরিক্ত বলা আছে, "তাদের চোখগুলো ছোট ছোট।" এই বর্ণনা অনুসারে সবচেয়ে শক্তিশালী মত হচ্ছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের চোখের আকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

মুগীরা ইবনে শুবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। এ কথা শুনে নবীজি ﷺ তাকে বললেন, "তাকে দেখে নাও, এতে করে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে।"[১]

একবার এক মহিলা নবীজি ﷺ-এর কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। নবীজি ﷺ তার দিকে একবার তাকালেন, আরেকবার ভালো করে তাকালেন। তারপর তাঁর চোখ নামিয়ে ফেললেন। মহিলাটি বুঝতে পারলেন, তিনি ﷺ আগ্রহী নন।[২]

বিয়ের আগে নবীজি ﷺ উম্মে সালিম রা.-এর কাছে একজন মহিলাকে এই বলে পাঠিয়েছিলেন, "তার মুখের গন্ধ আর দু-পায়ের নলার পেছনের মাংসপেশি খেয়াল করে দেখো।"[৩]

বর্তমানে বিয়ের প্রস্তাব থেকে শুরু করে কবুল বলা পর্যন্ত পুরো পথটি কৃত্রিম সব আচার-অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ থাকে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই সর্বোত্তম পোশাক পরে কেমন যেন অভিনয় করে। এই কৃত্রিমতার ধোঁয়াশায় হবু জীবনসঙ্গী সম্পর্কে খুব কমই ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের এ রীতি বদলানো প্রয়োজন। আমাদের এমন রীতি গড়ে তোলা উচিত যার মাধ্যমে হবু জীবনসঙ্গী সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। তার দ্বীনদারি, আদব-আখলাক, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি এসবই তো জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এমন জীবনসাথিই বেছে নেওয়া উচিত, যার সাথে আপনার নিজের চিন্তা-স্বভাবে মিলে।

এটা ঠিক, সম্পদ ও সৌন্দর্যের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্বভাব ও চরিত্রের সামনে এগুলো গৌণ। ইসলাম আমাদের দ্বীনদারি ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে বলে। জীবনসঙ্গী

---

১. আহমাদ (৪/২৪৫, ২৪৬), তিরমিজি (১০৮৭), দারিমি (২১৭২), নাসাঈ (৭/৬), ইবনে মাজাহ (১৮৬৫) এবং ইবনে হিব্বান (৪০৩২)

২. বুখারী (৫১২০)

৩. আহমাদ (৩/২৩১), তার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। বাযযারও একই হাদিস বর্ণনা করেছেন তার মাজমা' আয-যাওয়া'ইদে (৪/২৭৬)। হাকিম (২/১৬৬) হাদিসটি নির্ভরযোগ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে যাহাবী ও বায়হাকীও (৭/৮৭) বর্ণনা করেছেন।

নির্বাচনে ইসলামের এই নির্দেশকে সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। তারপর আসবে সম্পদ ও সৌন্দর্য।

দ্বীনদারি ও ধার্মিকতায় নিজের সাথে মিলে এমন মানুষকেই বিয়ে করা উচিত। এ ব্যাপারে আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'তোমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা স্মরণে রেখে উত্তম মেয়ে বিয়ে করো, সমতা (কুফু) বজায় রেখে বিয়ে করো, (নিজের মেয়েকে) বিয়ে দিতেও সমতা বজায় রাখো।'[১]

ধার্মিক জীবনসঙ্গী আপনাকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে সাহায্য করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'যাকে আল্লাহ ﷻ দ্বীনদার নারী (স্ত্রী হিসেবে) দিয়েছেন, তার দ্বীনের অর্ধেকের ব্যাপারে তাকে তিনি সাহায্য করেছেন। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন তাঁকে ভয় করে।'[২]

জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে দ্বীনদারিকে। এরপর আসে সৌন্দর্য। মানুষ তার স্ত্রীর সৌন্দর্যে সন্তুষ্ট থাকলে দ্বীনের পথে অবিচল থাকাও সহজ হয়। দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীর মাঝে পুরুষের অতৃপ্ত রয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে হাদিসে দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সৌন্দর্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়নি; বরং রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনদারি বাদ দিয়ে শুধু সৌন্দর্য বা অন্য কারণে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

সুন্দরী কিন্তু বেদ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। সে তার আচরণ যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি তালাক দিয়ে তাকে ছাড়া যে থাকবে, সেটাও পারে না। তার অবস্থা সেই লোকের মতো যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেছিল,

"আমার স্ত্রীকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি। অথচ সে কোনো স্পর্শকারীর হাত

---

১. ইবনে মাজাহ (১৯৬৮), হাকিম (২/১৬৩) এবং দারা কুতনী (৩/২৯৯)। আলবানি তার সহীহাতে হাদিসটি নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

২. হাকিম (২/১৬১)। তার মতে, 'এই হাদিসের সনদ নির্ভরযোগ্য, যদিও তারা (বুখারী ও মুসলিম) এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি।' যাহবীও একই মত দিয়েছেন। আলবানি তার সহীহাতে (৬২৫) একে হাসান বলেছেন।

ফিরিয়ে দেয় না[১]।" তিনি বললেন, "তাকে তালাক দাও।" সে বলল, "আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারব না।" তিনি বললেন, "তাহলে রেখে দাও।"[২]

রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে রাখার জন্য বলেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, হয়তো তালাক দেওয়ার পর লোকটি তাকে পাওয়ার জন্য নিষিদ্ধ পথে পা বাড়াতে পারে। তাই সৌন্দর্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনদারি ও তাকওয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো দ্বীনদার স্ত্রী।"[৩]

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

মানুষ তার নিজের ও পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা তার দায়িত্ব। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

---

১. 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর দু-ধরনের অর্থ হতে পারে। অনৈতিক সম্পর্ক করতে চায় এমন পুরুষকে সে ফিরিয়ে দেয় না, কিংবা কেউ তার স্বামীর সম্পদ চেয়ে বসলে সে 'না' করে না। অনেক আলিম বলেন, 'তাকে রাখো' এর অর্থ, 'তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।' অনেক আলিমের মতে, 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর অর্থ অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক নয়; বরং এরচেয়ে কম মাত্রার। যেমন : চুমো দেওয়া বা স্পর্শ করা। নতুবা লোকটি সরাসরি তার ব্যাপারে জিনার অভিযোগ করত। এই হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা 'আউনুল-মা'বুদ গ্রন্থে করা হয়েছে। 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর দু-ধরনের অর্থ হতে পারে। অনৈতিক সম্পর্ক করতে চায় এমন পুরুষকে সে ফিরিয়ে দেয় না, কিংবা কেউ তার স্বামীর সম্পদ চেয়ে বসলে সে 'না' করে না। অনেক আলিম বলেন, 'তাকে রাখো' এর অর্থ, 'তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখো।' অনেক আলিমের মতে, 'সে কোনো স্পর্শকারীর হাত ফিরিয়ে দেয় না' এর অর্থ অনৈতিক শারীরিক সম্পর্ক নয়; বরং এরচেয়ে কম মাত্রার। যেমন : চুমো দেওয়া বা স্পর্শ করা। নতুবা লোকটি সরাসরি তার ব্যাপারে জিনার অভিযোগ করত। এই হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা 'আউনুল-মা'বুদ গ্রন্থে করা হয়েছে।

২. নাসাঈ (৬/৬৭)

৩. মুসলিম (১৪৬৭), নাসাঈ (৬/৫৬, ৫৭), ইবনে মাজাহ (১৮৫৫), আহমাদ (২/১৬৮) এবং ইবনে হিব্বান (৪০২০)

“হে ঈমানদাররা, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”[১]

প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, পরিবারকে সদুপদেশ দেওয়া, তাদের অধিকার রক্ষা করা। শুধু পুরুষ পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল এমনটা ভাববেন না; নারীরও দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীর পছন্দমতো সংসার চালনা, সন্তানদের যত্ন নেওয়া, স্বামীকে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি তার দায়িত্ব।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধনসম্পদের রক্ষক, তাকে তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ পাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।”[২]

স্বামীর সেবা করা

স্বামীর জন্য স্ত্রীর কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তবে এর পরিধি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন,

‘স্বামীর জন্য বিছানা গুছিয়ে দেওয়া, খাবার-পানীয় পরিবেশন করা, আটার খামির বানানো, চাকর ও গবাদি পশুর খাবার দেওয়া এসব স্ত্রীর দায়িত্বের মাঝে পড়ে কি না সে নিয়ে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। কোনো কোনো আলিম বলেন, “স্বামীর জন্য কাজ করা তার দায়িত্ব না।” কিন্তু এ মতটি সেই মতের মতোই দুর্বল যেখানে বলা হয়, “পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক রাখা জরুরি নয়।” বরং এমনটা করা স্ত্রীর সাথে বেইনসাফী।

সব দিক বিবেচনা করে সবচেয়ে সঠিক মত হলো, (শরীয়তসম্মত) যেকোনো কাজে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। কেননা, আল্লাহর কিতাব মোতাবেক স্বামী তার ওপরে কর্তৃত্বশীল। আলিমদের মধ্যে যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাদের কেউ

---

১. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

২. বুখারী (৮৯৩), মুসলিম (১৮২৯), আবু দাউদ (২৯২৮), তিরমিজি (১৭০৫), আহমাদ (২/৫, ৫৪, ৫৫, ১১১, ১২১), ইবনে হিব্বান (৪৪৭৩)

কেউ বলেন, "তাকে কিছু কাজ তো অবশ্যই করতে হবে।" তাদের অনেকে এও বলেন, "কাজের ধরন হবে মা'রূফ (প্রচলিত প্রথা) অনুসারে।" এই শেষোক্ত মতটিই সঠিক।

স্ত্রী অবশ্যই মা'রূফ অনুসারে স্বামীর জন্য কাজ করবেন। এই মা'রুফের অর্থ হচ্ছে, মর্যাদার ওপরে ভিত্তি করে সমাজের প্রচলিত মানদণ্ড। মরুবাসী পরিবারের স্ত্রীর কাজ যেমন শহুরে স্ত্রীর কাজের সাথে মিলবে না, তেমনি শক্তসমর্থ নারীর সাথে দুর্বল নারীর কাজে মিল হবে না (তাই কাজের ধরন মা'রূফের ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা, তাদের সমাজের প্রথা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে)।'[১]

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ এমন অনেক নারী পাওয়া যাবে যাদের অনেক রেস্তোরাঁর নাম মুখস্থ, অথচ নিজে একটি ডিমও রান্না করতে পারে না! এ ক্ষেত্রে নারীদের অনুসরণীয় আদর্শ হলো রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়ে, জান্নাতি নারীদের প্রধান—ফাতিমা রা.। পরিবারের জন্য রুটি বানাতে তিনি নিজ হাতে জাঁতায় বার্লি আর গম পিষতেন। এতে তার হাতের তালুতে বহু ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল!

নবীদের পিতা ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রীও আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ। ইবরাহীম আ. একবার অতিথিদের জন্য একটি বাছুর নিয়ে এলেন স্ত্রীর কাছে। তার স্ত্রী তাদের জন্য পুরো বাছুরটি রান্না করলেন! অবশ্য এই অতিথিরা ছিলেন সম্মানিত ফেরেশতা, যারা কখনো খাবার খান না। আল-কুরআনে কত সুন্দরভাবে ঘটনাটি এসেছে :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

"তোমার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে কি? যখন তারা তার কাছে এল এবং বলল, 'সালাম'; উত্তরে সেও বলল, 'সালাম', এরা তো অপরিচিত লোক! তখন সে তাড়াতাড়ি তার ঘরের লোকেদের নিকট চলে গেল এবং একটি মোটাতাজা (ভাজা) বাছুর নিয়ে এল। তাদের সামনে রাখল এবং বলল, 'তোমরা খাবে না?'"[২]

১. ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ (২/২৩৪, ২৩৫)
২. আল-কুরআন, ৫১ : ২৪-২৭

স্বামীর আনুগত্য করা

স্বামীর প্রতিটি হালাল নির্দেশ মানতে তার স্ত্রী বাধ্য। তবে স্বামী পাপ করতে বললে তার বিরোধিতা করা স্ত্রীর কর্তব্য। পরিষ্কারভাবে আমাদের দ্বীনে বলা আছে, "স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির বাধ্য থাকা কখনোই জায়েজ নয়।"

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ের কথা। জনৈক মেয়ের বিয়ের পর তার মাথার চুল পড়ে যেতে লাগল। তার মা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসে জানালেন, "ওর স্বামী আমাকে ওর মাথায় (নকল) চুল লাগাতে বলেছে।"

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমনটা কোরো না। মাথায় নকল চুল পরিধানকারী মহিলাদের ওপর আল্লাহ ﷻ লা'নত বর্ষণ করেন।"

ইমাম বুখারী এই হাদিসের অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, "পাপ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না।"[১]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾

"তারা তোমাদের অনুগত হলে তাদের ওপর নির্যাতনের বাহানা খুঁজো না।"[২]

একাধিক হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের স্বামীর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। একবার নবীজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ, কোন নারী সর্বোত্তম?"

তিনি বললেন, "এমন (নারী) যার দিকে তাকালে স্বামী সন্তুষ্ট হয়। স্বামী আদেশ করলে সে তার আনুগত্য করে। তার ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামী অপছন্দ করে এমন কোনো কাজ সে করে না।"[৩]

অন্য আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, "যদি নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আর স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে তার

---

১. বুখারী (৫২০৫), মুসলিম (২১২২, ২১২৩)
২. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪
৩. নাসাঈ (৩২৩১)

পছন্দমতো জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে।"[১]

হুসাইন বিন মিহছন রা. থেকে বর্ণিত, তার খালা রা. বলেন, "আমি কোনো প্রয়োজনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামী আছে?" আমি উত্তরে বললাম, "আছে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার সাথে কেমন ব্যবহার করো?" আমি বললাম, "যেসব কাজে সামর্থ্য নেই, সেসব ছাড়া বাকি সব কাজে তার আদেশ মানতে ও সেবা করতে আমি কোনো গাফলতি করি না।" নবিজি বললেন,

"তার দৃষ্টিতে তোমার স্থান কোথায়, সে ব্যাপারে সাবধান থেকো। কারণ সে-ই তোমার জান্নাত, সে-ই তোমার জাহান্নাম।"[২]

স্বামীর আনুগত্যের মর্যাদা

একবার এক মহিলা সাহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আল্লাহর রসূল, আমি নারীদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে এসেছি। তাদের সবাই চাচ্ছিল আমি যেন আপনার কাছে আসি। আল্লাহ নারী-পুরুষ সবার রব, সবার ইলাহ। আর আপনি নারী-পুরুষ সবার কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল।

আল্লাহ পুরুষদের জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের গণিমত পেয়ে তারা ধনবান হয়, কিংবা শহীদ হয়ে রবের কাছে জীবিত হিসেবে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করে। আমাদের জন্য তাদের সমতুল্য এ রকম কী ইবাদাত রয়েছে?"

তিনি ﷺ বললেন,

"স্বামীর আনুগত্য করা ও তার অধিকার সম্পর্কে জানা। তোমাদের মধ্যে খুব কমই এমনটা করে।"[৩]

ইসলামে কেবল পুরুষদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ জিহাদ হলো 'আস-সানাম'—দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। ওপরের হাদিসে রসূলুল্লাহ

১. ইবনে হিব্বান (৪১৫১), হিলইয়াতুল আওলিয়া (৬/৩০৮)
২. ইবন সা'দ (৮/৪৫৯), আহমাদ (৪/৩৪১), আওসাত, তাবারানি (১/১৭০), হাকিম (২/১২৯), বায়হাকী (৭/২৯১)। হাকিম ও যাহাবী দুজনেই হাদিসটি নির্ভরযোগ্য বলেছেন।
৩. আহমাদ ও তাবারানি কর্তৃক কাবির গ্রন্থে বর্ণিত। হুসাইন ছাড়া এই হাদিসের সবাই আস-সহীহর রাবী, তিনি নিজেও নির্ভরযোগ্য। দেখুন : মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ (৪/৩০৬)

ﷺ-এর উত্তর নিয়ে নারীদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। একজন নারীর জন্য তার স্বামীর আনুগত্য করা, তার অধিকারগুলো পুরোপুরি আদায় করার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য—যা কিনা দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর।

জিহাদ ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের মধ্যে বহু মিল রয়েছে। পুরুষ যেমন নফসের বিরোধিতা করে ভয় ও সংশয়কে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে; ঠিক তেমনি নারী তার অহম ও বিদ্রোহী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামীর আনুগত্য করে। স্বামী-অনুগতা স্ত্রীকে তাই শহীদের মতো জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। এ ধরনের নারীরা এ দুনিয়ায় যেমন মানসিক সুখ-শান্তিতে থাকে, তেমনি পরকালে প্রচুর পুরস্কৃত হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে।'[১]

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা

স্ত্রী যেমন স্বামীর জন্য কাজ করবে, তেমনি সময় পেলে পুরুষেরও উচিত গৃহস্থালি কাজে স্ত্রীর সাথে হাত লাগানো। একজন মুসলিম হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব স্ত্রীর প্রতি সদয় হওয়া। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সলাতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।"[২]

হিশাম ইবনে উরওয়াহ রা. থেকে বর্ণিত, তার বাবা বলেন, আমি আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, "বাসায় নবীজি ﷺ কী কাজ করতেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তিনি কাপড় সেলাই করতেন, জুতো ঠিক করতেন—সাধারণ পুরুষরা যা যা বাসায় করে তার সবই তিনি করতেন।"[৩]

আরেক হাদিসে আয়িশা রা. বলেন, "তিনি সাধারণ মানুষদের মতোই সাধারণ ছিলেন—তিনি জামা খুঁটিয়ে দেখতেন (কোনো পোকা-মাকড় বা ময়লা আছে কি না), ভেড়ার দুধ দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন।"[৪]

---

১. ইবনে মাজাহ (১৮৫৪), তিরমিজি (১১৬১) এবং হাকিম (৪/১৭৩)
২. বুখারী (৬০৩৯), তিরমিজি (২৪৮৯) এবং আহমাদ (৬/৪৯, ১২৬, ২০৬)
৩. আশ শামাইল (২/১৮৫), তাবাকাত ইবনে সা'দ (১/৩৬৬) এবং আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ (৬৭০)
৪. ফাতহুল বারী (১০/৪৭৬)

দয়া ও ধৈর্য যখন হাতিয়ার

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'নারীদের সাথে ভালো আচরণ করো। কারণ, তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; আর পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হলো ওপরের অংশ। তুমি সেটাকে সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে। আর ফেলে রাখলে (সোজা করার চেষ্টা না করলে) সেভাবেই সে থেকে যাবে। তাই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।'[১]

এর আক্ষরিক অর্থ হলো, নারীদের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; যেভাবে হাওয়া আ.-কে আদম আ.-এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হলো ওপরের অংশ' এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে নারীদের শরীরের সবচেয়ে বাঁকা অংশ তাদের দেহের উপরিভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ তার জিহ্বা, যা সোজা করা খুব কঠিন।

এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের স্বভাবের ব্যাপারে পুরুষদের ধৈর্যশীল হতে বলেছেন। 'তুমি সেটাকে সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে' এর অর্থ হলো, তার আচরণ সংশোধনে চাপাচাপি করলে সে সোজা তো হবেই না, বরং ভেঙে যাবে। এই ভেঙে যাওয়ার অর্থ হলো তালাক। একই হাদিস মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে,

'নারী পাঁজরের হাড়ের মতো (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে তখন তা ভেঙে ফেলবে, আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।'[২]

রসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন, ধৈর্যশীল না থাকলে মানুষ কখনোই তার স্ত্রীর সাথে বসবাসে শান্তি-স্বস্তি খুঁজে পাবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। তারা তো তোমাদের কাছে বন্দিনী।..."[৩]

---

১. বুখারী (৩৩৩১), মুসলিম (১৪৬৮), আহমাদ (৯২৪০), তিরমিজি (১১৮৮) এবং দারিমি (২২২২)
২. মুসলিম (১৪৬৮)
৩. আহমাদ (৫/৭২-৭৩), ইবনে মাজাহ (১৮৫১)

স্ত্রীর সাথে আচরণে স্বামীর সব সময় মনে রাখতে হবে, নারীরা উত্তেজনাপ্রবণ, আবেগী ও অস্থির প্রকৃতির। তাই তার চরিত্রের ভালো-মন্দ দুদিকই মেনে নিতে হবে। নারীরা মাঝে মাঝে মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। এ সময় স্বামীকে ধৈর্যশীল হতে হবে, তার মন ভালো করার জন্য হাসি-মজা করতে হবে। শুধু এটুকু মেনে চললেই স্ত্রীর সাথে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে আমাদের সেরা পথিকৃৎ হচ্ছেন রসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেন,

'পরিপূর্ণ ঈমানদার তো সে-ই, যে আচরণে ভালো এবং নিজ পরিবারের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করে।'[১]

তিনি ﷺ আরও বলেন,

'তোমাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে ভালো, যে তার নারীর (স্ত্রীর) কাছে সবচেয়ে ভালো। আর আমি আমার নারীদের কাছে তোমাদের চেয়ে (তোমাদের স্ত্রীদের কাছে তোমরা যেমন তার চেয়ে) সবচেয়ে ভালো।'[২]

নারীরা সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ ও অস্থির প্রকৃতির হয়ে থাকলেও তারা বোঝে যে, প্রকৃতিগতভাবে তারা পুরুষের অধীনস্থ; নেতৃত্ব তাদের জন্য নয়। নারীরা তাই পুরুষের কাছে সদয়-নম্র আচরণ আশা করে।

অবশ্য তারা খুব অল্পতেই রেগে যায়। স্ত্রীর সাথে আচরণের সময় তার প্রকৃতিগত এই স্বভাবগুলোর কথা স্বামীকে মাথায় রাখতে হবে। এটা স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার। রাগ এলেও স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করা যাবে না। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশমতো কোমল আচরণ করতে হবে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

ভেবে দেখুন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীরাও কখনো কখনো তাঁর সাথে মুখে মুখে কথা বলেছেন। এমন ঘটনাও আছে যে, রাত না হওয়া পর্যন্ত সারাদিন তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী কথা বলেননি।[৩] বিশেষত স্ত্রী যখন ঈর্ষাকাতর বা ঠুনকো যুক্তিতে

১. আহমাদ (৬/৪৭, ৯৯), তিরমিজি (২৬১২)। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত।
২. তিরমিজি (৩৮৯৫), দারিমি (২২৬০) এবং ইবনে হিব্বান (৪১৬৫)। দেখুন : আস-সহীহাহ (১/৫৬৩), সহীহ-আল জামি' (৩/১২৯)।
৩. বুখারী (৫১৯১), ইবনে হিব্বান (৪১৭৫)

বেঁকে বসে, তখন স্বামীর উচিত আরও বেশি ধৈর্যশীল হওয়া।[১]

ছোট ছোট ভুল

স্ত্রীর ভুল ধরতে স্বামী সব সময় খড়্গহস্তে থাকবে এমনটা কখনোই কাম্য নয়। বরং কোনো ভুল চোখে পড়লে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একই সাথে তার অন্য ভালো গুণগুলোর কথা মনে করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"...তাদের সাথে দয়ামায়ার সম্পর্ক বজায় রাখো। যদি তাদের কোনো কিছু অপছন্দ হয়—হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যার মাঝে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[২]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'কোনো ঈমানদার পুরুষ কোনো ঈমানদার নারীকে তিরস্কার করবে না; হয়তো তার কোনো অভ্যাসকে অপছন্দ হলেও তার অন্য কোনোটি (অভ্যাস) সে পছন্দ করবে (অর্থাৎ তার আচরণে ত্রুটি থাকলেও, সে একই সাথে ধার্মিক, পবিত্রা বা সুন্দরী মনে রাখতে হবে)।'[৩]

তা ছাড়া আমরা আগেই এই হাদিসটি বলেছি, "পরিপূর্ণ মু'মিন তো সে-ই, যে ব্যবহারে ভালো ও নিজ পরিবারের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে।"[৪]

---

১. এক সহীহ হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মন ও দ্বীন দুদিক দিয়েই নারীরা অসম্পূর্ণ।' [বুখারী (১৪৬২), মুসলিম (৭৯), ইবনে মাজাহ (৪০০৩), তিরমিজি (২৬১৩) এবং আহমাদ (২/২৭, ৩৭৩, ৩৭৪)]
২. আল-কুরআন, ৪ : ১৯
৩. মুসলিম (১৪৬৯), আহমাদ (৯২/৩২৯)
৪. আহমাদ (৬/৪৭, ৯৯), তিরমিজি (২৬১২)। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত।

স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ

শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বংশধারা জারি রাখা বিয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিয়ের মাধ্যমে দেহ-মনের কামনা পূরণের বৈধ পথ তৈরি হয়। দুজনেই তাদের সব ইন্দ্রিয় একীভূত করে শরীর-মনের তৃপ্তি লাভ করে। এভাবে তারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে, পবিত্র মনে ইবাদাতে মনোযোগ দিতে পারে। আসলে নফস সব সময় একঘেয়েমি থেকে ছুটে পালাতে চায়, ভুল পথে পা বাড়াতে উন্মুখ থাকে। এ কারণে বিয়ে পবিত্রতা ও দ্বীন রক্ষায় অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে।

আবু সুলাইমান আদ দারানি রহ. বলেন, “দ্বীনদার স্ত্রী এই পৃথিবীতে নিয়ামত—তিনি আপনাকে (পাপ থেকে) মুক্ত রাখেন, আপনার সময় ও শক্তিকে আখিরাতের কাজে লাগাতে সাহায্য করেন।”

স্ত্রী নিজ প্রজ্ঞা ও নিপুণতায় পরিবার গুছিয়ে রাখেন। তিনি স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করেন। এভাবে তিনি স্বামীর জন্য দুনিয়ায় পথচলায় যেমন সাহায্য করেন, তেমনি আখিরাতের পথে এগিয়ে যেতেও সাহায্য করেন।

স্বামীর শারীরিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা স্ত্রীর জন্য হারাম। ইসলামসম্মত বৈধ কারণ ছাড়া স্বামীর এই প্রস্তাব নাকচ করার অধিকার তার নেই।[১] বেশ কিছু সহীহ হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

‘যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই শয্যায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ওই মহিলাকে অভিশাপ দিতে থাকে।’[২]

একই হাদিসের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, “যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে রাত কাটায়, তাহলে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।”[৩]

---

১. হজ্জ বা উমরাহ পালনকালে নির্দিষ্ট একটি সময়ে ইসলাম শারীরিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেছে। এ সময় স্ত্রী তার স্বামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অসুস্থ অবস্থায়, ঋতুমতী অবস্থায় ও প্রসবোত্তর রক্তপাতের সময়ে স্বামীকে সে নিষেধ করতে পারে।

২. বুখারী (৩২৩৭)

৩. বুখারী (৫১৯৩, ৫১৯৪), মুসলিম (১৪৩৬), ইবনে হিব্বান (৪১৬১) এবং আহমাদ (২/৪৩৯, ৪৮০)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, "কসম সে সত্তার, যার হাতে আমার জীবন। কোনো ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট হয় না, ততক্ষণ আসমানবাসী তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে।"[১]

'আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আমি যদি মানুষকে আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার রবের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারবে না। স্ত্রী কাতাবের[২] ওপর থাকা অবস্থায়ও স্বামী তার সাথে শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর নিষেধ করা যাবে না।'[৩]

আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'কেউ তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন সাথে সাথে তার কাছে আসে, এমনকি সে চুলার ওপর রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও।'[৪]

নারীদের মনে রাখতে হবে, শারীরিক কামনার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অনেক কম। পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা অনেক বেশি কষ্টকর। ফলে আশঙ্কা থাকে, কোনো বেগানা নারীর দিকে চোখ পড়ার পর নজরকে দীর্ঘায়ত করে ফেলতে পারে। পুরুষদের শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাই কম নয়, শারীরিক ব্যাপারগুলো নিয়ে নারীদের চেয়ে তারা বেশি ঘনঘন চিন্তা করে। তাই স্ত্রী যদি স্বামীর প্রস্তাব কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে কবিরা গুনাহ করল, ফেরেশতাদের অভিশাপ নিজের ওপর ডেকে আনল। কোনো স্বামী যখন স্ত্রীর ওপর রেগে থাকে, আল্লাহও ﷻ তার ওপর রেগে থাকবেন (অবশ্য বৈধ কারণে এমনটা হলে তার ভয়ের কিছু নেই, যেমনটা আমরা আগেই বলেছি)।

---

১. মুসলিম (১৪৩৬)
২. উটের ওপরে জিন বা আসন
৩. আহমাদ (৪/৩৮১) এবং ইবনে মাজাহ (১৮৫৩)
৪. আহমাদ (৪/২৩), তিরমিজি (১১৬০) এবং ইবনে হিব্বান (৪১৫৩)

তা ছাড়া স্বামীর শারীরিক প্রস্তাব উপেক্ষা করার মাধ্যমে স্ত্রী তার মর্যাদা ও পুরুষত্বে আঘাত হানে। এতে সে রেগে যায়, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। এ অন্যায়ের মাধ্যমে স্বামীকে রাগিয়ে তোলায় স্ত্রীর ইবাদাত কবুল হয় না। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'তিন ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার এক বিঘত ওপরেও উঠে না—যে ব্যক্তি মানুষের অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টিসহ রাত কাটায়, আর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ভাই।'[১]

স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা পূরণ

দাম্পত্য জীবনের অধিকারগুলো অনেকটা উভমুখী কাজ করে। নারীকে যেমন স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণে যত্নশীল হতে হবে, তেমনি পুরুষকেও স্ত্রীর ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে যত্নশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে অধিক ইবাদাত কোনো অজুহাত হতে পারে না।

সাহাবী 'উসমান বিন মায'উন রা.-এর স্ত্রী অভ্যাসবশত চুল রাঙাতেন ও সুগন্ধি লাগাতেন। হঠাৎ একদিন তিনি এসব করা ছেড়ে দিলেন। সেভাবে আয়িশা রা.-এর ঘরে এলেন। তাকে দেখে আয়িশা রা. অবাক হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিসে তোমাকে এমন করতে বাধ্য করল?" তিনি জবাবে বললেন, "উম্মুল মু'মিনীন! 'উসমান দুনিয়া-নারী কোনোটাই চায় না।"

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ঢুকলেন। আয়িশা রা. তাঁকে 'উসমান সম্পর্কে জানালেন। তিনি ﷺ 'উসমান রা.-কে ডেকে পাঠালেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "'উসমান, আমরা যা বিশ্বাস করি, তুমিও কি তা-ই বিশ্বাস করো?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তবে, আমরা তোমার জন্য উদাহরণস্বরূপ।"[২]

'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন আল-'আস রা. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "'আবদুল্লাহ, আমাকে এ খবর কি

---

১. ইবনে মাজাহ (৯৭১) এবং ইবনে হিব্বান (১৭৫৪), ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদিস তিরমিজিতে (৩৬০) এসেছে।

২. আহমাদ (৬/১০৬), নাইলুল আউতার (৬/১০৫)

(ঠিকভাবে) দেওয়া হয়েছে যে, তুমি রাতভর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকো ও দিনভর সিয়াম পালন করো?"

তিনি রা. বললেন, "হ্যাঁ (আপনাকে যা জানানো হয়েছে তা সত্য), আল্লাহর রসূল!"

তিনি ﷺ বললেন, "এমনটা কোরো না। বরং সিয়াম পালন করো, আবার ইফতারও করো। রাত জেগে ইবাদাত করো, ঘুমাতেও যাও। তোমার ওপর তোমার শরীরের হক্ক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখের হক্ক আছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক্ক আছে।"[১]

ইবনে বাত্তাল বলেন, "স্বামীর জন্য ইবাদাতে এতটা ডুবে যাওয়া উচিত নয়, যেন সে তার স্ত্রীর হক আদায়ে ব্যর্থ হয়; চাই তা শারীরিক চাহিদার হক্কই হোক আর উপার্জন করার মাধ্যমে তার খোরপোশ পাবার হক্কই হোক।"

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা রয়েছে। একবার এক মহিলা 'উমার ইবনে খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে তাকে এসে বলল, "আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী দিনের বেলা সাওম পালন করে আর রাতের বেলা সলাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি তার ব্যাপারে অভিযোগ করতে লজ্জাবোধ করছি। তিনি যেহেতু আল্লাহর আদেশ পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন!"

'উমার রা. বলে উঠলেন, "কত চমৎকার স্বামী!"

মহিলাটি একই কথা তাকে কয়েকবার বলল। 'উমার রা.-ও প্রতিবার তাকে একই উত্তর দিলেন। তখন কা'ব আল-আসদী রা. তাকে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন, এই মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছে। সে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করছে, তার স্বামী তার থেকে দূরে থাকে, তার শয্যা থেকেও দূরে থাকে।"

'উমার রা. বললেন, "তুমি তার কথা বুঝতে পেরেছ, তুমিই তাহলে ফয়সালা করো।"

কা'ব রা. বললেন, "তার স্বামীকে আমার কাছে আসতে বলুন।"

---

১. বুখারী (৫১৯৯)

সে এলে তিনি তাকে বললেন, "তোমার স্ত্রী তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।"

"অভিযোগ কি খাবার-পানীয়ের ঘাটতির ব্যাপারে?" সে জানতে চাইল।

কা'ব রা. উত্তর দিলেন, "না।"

তখন মহিলাটি বিস্তারিত বলা শুরু করল, "হে জ্ঞানী ন্যায়পরায়ণ বিচারক, কাছের মসজিদ তাকে আমার শয্যাবিমুখ করেছে। তার ইবাদাত তাকে আমার শয্যা থেকে দূরে রেখেছে। এ বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে রায় দিন, কা'ব। দিনে বা রাতে সে কখনোই শয্যায় আসে না। নারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষায় আমি তার তারিফ করতে পারছি না।"

তার স্বামী উত্তরে বললেন, "আমি আসলেই তার শয্যা ও হাজাল (নবদম্পতির জন্য সাজানো বাড়ি) থেকে দূরে থাকি। সূরা আন-নাহল ও লম্বা সাতটি সূরার[১] মাঝে আমার আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছি। আল্লাহর কিতাবে কঠোর সতর্কবার্তা পেয়েছি।"

তখন কা'ব রা. তার রায় হিসেবে আয়াতের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে বললেন, "হে পুরুষ, অবশ্যই তোমার ওপরে তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের জন্য প্রতি চার রাতের মধ্যে এক রাত দেওয়া যথেষ্ট। তাই অজুহাত বাদ দিয়ে তার অধিকার আদায় করো।"

তিনি আরও বললেন, "জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমার জন্য দুই, তিন অথবা চারজন স্ত্রী রাখাকে বৈধ করেছেন। যদি তোমার চারজন স্ত্রী থাকত তবে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে প্রতি চার রাতের মধ্যে একরাত কাটাতে হতো। সেখানে এখন তুমি আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য প্রতি চার রাতের মধ্যে তিন রাত পাচ্ছ।"

এ ঘটনা শেষে 'উমার রা. কা'বকে বললেন, "আল্লাহর কসম! বুঝছি না কোনটাতে আমি বেশি বিস্মিত হব—তাদের বিষয়ে তোমার অন্তর্দৃষ্টির ওপর, নাকি তোমার রায়ের ওপর! যাও, তোমাকে আমি বসরার বিচারক নিযুক্ত করলাম।"

---

১. সূরা আল-বাকারা থেকে সূরা আল-আরাফ পর্যন্ত ছয়টি; আর সপ্তমটির ব্যাপারে কেউ কেউ আল-আনফাল এবং আল-বারা'আহকে একত্রে একটি সূরা হিসেবে মনে করেন। অন্যরা বলেন, সপ্তম সূরা বলতে সূরা ইউনুসকে বোঝানো হয়েছে।

কখন স্ত্রীর শয্যা ছেড়ে থাকা স্বামীর জন্য বৈধ?

স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে স্বামী তার বিছানা ছেড়ে থাকতে পারে। স্ত্রী যদি ইসলামে বৈধ এমন কোনো বিষয়ে স্বামীর আদেশ অমান্য করে, তবে স্বামী এমনটা করতে পারবে। স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া ও সতর্ক করার পরও যদি কোনো পরিবর্তন না দেখা যায়, কেবল তখনই স্বামী তার বিছানা থেকে আলাদা থাকতে পারবে।

শারীরিক সম্পর্কের আগে প্রস্তুতি

শারীরিক সম্পর্কের আগে মানসিকভাবে স্বামী-স্ত্রীর প্রস্তুতি শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ের উচিত সঙ্গীর জন্য স্বস্তিমূলক ও আরামদায়ক আবহ তৈরির চেষ্টা করা। এমনটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় আবেগময় ভালোবাসা তৈরি করে।

স্ত্রীর কাছে কামনা পূরণে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চেয়ে কষ্টদায়ক বিষয় একজন পুরুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। স্বামীর প্রতি নিরুত্তাপ আচরণ ও দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে সংসারে অশান্তি বাড়ে বৈ কমে না। এমন আচরণ উভয়কে মানসিকভাবে বিষাদগ্রস্ত তো করেই, বিচ্ছেদ পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক গড়তে চাইলে এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে উভয়কে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামীই শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি নেয়। তখন স্ত্রীর উচিত নাকচ না করে সাড়া দেওয়া। তার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া। এ সময় নারী যেন নিরুত্তাপ না থাকে; বরং অন্তরঙ্গ হবার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে তাকে সক্রিয় হতে হবে।

নিম্নোক্ত হাদিসটিতে পরোক্ষভাবে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। বয়স্কা মহিলা বিয়ে করার কারণে জাবির রা.-কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

"তুমি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তার সঙ্গে হাসি-খেলা করতে পারতে, আর সেও তোমার সঙ্গে হাসি-খেলা করত।"[১]

---

১. বুখারী (৫০৭৯), মুসলিম (৭১৫), আবু দাউদ (২০৪৮), নাসাঈ (৬/৬৫), ইবনে মাজাহ (১৮৬০), দারিমি (২২১৬), আহমাদ (৩/২৯৪, ৩০২, ৩০৮, ৩১৪, ৩৬২, ৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৬) এবং ইবনে হিব্বান (৭০৯৪)

নফল ইবাদাত নাকি স্বামীর চাহিদা পূরণ

কিছু আগেই আমরা দেখলাম, স্ত্রী যথাযথ ইসলামী কারণ ছাড়া তার স্বামীর শারীরিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। এমনকি যদি তাকে নফল ইবাদাত ও স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পাবে। সাওমের কথাই ধরুন। সাওম পালনকালে শারীরিক মিলন নিষিদ্ধ। স্ত্রী যখন সাওম রাখে, তখন সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য নফল সিয়াম রাখার আগে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নারীর জন্য (নফল) সওম পালন জায়েজ নয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে অন্য কাউকে তার বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। কোনো স্ত্রী স্বামীর আদেশের বাইরে[১] তার সম্পদ থেকে খরচ করলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।"[২]

শরীয়ত-নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে যেকোনো মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে কামনা পূরণের অধিকার স্বামীর রয়েছে। এখনই করতে হবে এমন ফরযকে শরীয়ত প্রাধান্য দিয়েছে নফল ও পরে করা যায় এমন ফরযের ওপর। তাই স্বামী দিনের বেলা শারীরিক মিলনের ইচ্ছা করলে স্ত্রী নফল সাওম রাখতে পারবে না। যদি রেখে থাকে, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে।

---

১. 'আদেশের বাইরে' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্ত্রী যে বস্তু দান করছে স্বামী তা নির্দিষ্টভাবে বলে দেয়নি; তবে ওই পরিমাণ দানের কারণে স্বামী অসন্তুষ্ট হবে না। অর্থাৎ, সামান্য পরিমাণ সম্পদ যতটুকু দান করার অনুমতি স্বামীর অতীত অভ্যাস-আচরণ থেকে বোঝা গেছে। অন্যথায় স্ত্রীকে পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ দেওয়ার পরও স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার মাল থেকে অতিরিক্ত দান-খয়রাত করলে সে গুনাহগার হবে। আবু দাউদ শরীফের ১৬৮৮ নং হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তাঁকে এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলো, যে তার স্বামীর ঘর হতে দান করে। তিনি বলেন, 'না, তবে তার নিজের ভরণ-পোষণের অংশ থেকে দান করতে পারে। এর সওয়াব উভয়েই প্রাপ্ত হবে। আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা বৈধ নয়।' বুখারী-মুসলিমের অন্য বর্ণনা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। আয়িশা রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু সাদকা করলে বা আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে, স্বামীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চিও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে—স্বামী উপার্জন করার কারণে আর স্ত্রী দান করার কারণে।" এ বর্ণনা দ্বারা সওয়াব অর্ধার্ধি ভাগাভাগি হওয়ার কারণও স্পষ্ট হয়ে গেল—স্বামী উপার্জনকারী আর স্ত্রী নিজ খরচের থেকে দানকারী, তাই।-সম্পাদক।

২. বুখারী (৫১৯৫), মুসলিম (১০২৬)

উপরোক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "স্বামীর উপস্থিতিতে..." অর্থাৎ যদি সে অনুপস্থিত থাকে (যেমন : সফরে), তবে স্ত্রী নিজ ইচ্ছামাফিক সাওম পালন করতে পারবে। অনুরূপভাবে স্বামী অসুস্থতার কারণে শারীরিক মিলন করতে না পারলে তা-ও অনুপস্থিতি বলে গণ্য হবে। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা আছে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই অধিকার নফল ইবাদাতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু মহিলা মনে করেন, অনেক বেশি ইবাদাত তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। এটা তার কাছে স্বামী ও পরিবারের খেদমত করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ ইসলাম বলে— একজন নারী প্রথমে আল্লাহর হক্ক যত্নের সাথে আদায় করবে, তারপর তার স্বামীর হক্ক আদায় করবে, তারপর নফল ইবাদাত। আর আমরা আগেই দেখেছি, স্বামীর অনুগত থাকা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য।

আবু সা'ঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা এসে বলল, "আমি যখন সলাত আদায় করি তখন আমার স্বামী সাফওয়ান বিন মু'আত্তাল আমাকে আঘাত করে, সাওম রাখলে তা ভাঙতে বাধ্য করে, সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সে ফজরের সলাত আদায় করে না!"

সে সময় সাফওয়ান রা. রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। নবিজি ﷺ তার কাছে নিজ স্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। সাফওয়ান রা. বললেন, "আল্লাহর রসূল, সে বলেছে, 'আমি যখন সলাত আদায় করি তখন আমার স্বামী আমাকে আঘাত করে।' আসলে সে দুটি সূরা তিলাওয়াত করে। আমি তাকে এমনটা করতে নিষেধ করেছি।" রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে বললেন,

"একটি সূরাই মানুষের জন্য যথেষ্ট (জামা'আতে ও একাকী উভয় ক্ষেত্রেই)।"

এরপর সাফওয়ান রা. বললেন, "সে বলেছে, 'আমি সাওম রাখলে সে তা ভাঙতে বাধ্য করে।' সে আসলে প্রচুর (নফল) সাওম রাখে। আর আমি যুবক মানুষ, আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি না!"

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর জন্য (নফল) সাওম পালন জায়েজ নয়।"

এরপর সাফওয়ান রা. বললেন, "সে বলেছে, 'সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সে ফজরের সলাত

আদায় করে না।' আমরা কারিগর হিসেবে পরিচিত। আমরা অনেক সময় সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারি না।"[১]

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখনই ঘুম থেকে উঠবে তখনই সলাত আদায় করে নেবে।"[২]

স্বামীর কাছে অপরের সৌন্দর্য বর্ণনা করা

'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো নারী যেন তার দেখা অন্য নারীর দেহের বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।"[৩]

এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে প্রজ্ঞা হলো—বর্ণিত নারীর প্রতি পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করতে পারে, ওই নারীর সাথে দেখা করতে পারে, কুকর্মে পর্যন্ত লিপ্ত হতে পারে। এসব অনেক সময় তালাক পর্যন্ত গড়াতে পারে।

অনেক সময় স্ত্রী কোনো নারীর সৌন্দর্য ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে তার কথা সরল মনে স্বামীর কাছে বলে বসে। ওই নারীর বন্ধুত্ব তার ভালো লাগে। প্রতিবার তার সাথে দেখা হবার পর স্বামীকে সে আগ্রহভরে তার কথা বলতে থাকে। কিন্তু সে ভুলে যায়, চোখের আগে অন্তর প্রেমে পড়ে। হয়তো তাদের দাম্পত্য জীবন সহজ সরল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল, এ ঘটনার পর সবকিছু নষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু সে এর কারণ বুঝতে পারে না।

এভাবে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে শয়তান পরিবারটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ওই নারীকে দেখার জন্য শয়তান স্বামীর মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। সে পুরুষ হিসেবে দুর্বল হলে ওই নারীকে দেখার, সম্ভব হলে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে থাকে। তার বৈবাহিক অবস্থা, বয়স, ঠিকানা—এসব নানা বিষয়ে যথাসম্ভব জানার চেষ্টা করে।

---

১. তার মতো কারিগররা রাতের বেলা কাজ করতেন। গভীর রাতে ঘুমিয়ে যেতেন, পরে সূর্য ওঠার পর জেগে উঠতেন। তার পরিস্থিতি অনেকটা অভ্যাসের কাছে পরাস্থ মানুষের মতো, যে জেগে উঠতে পারে না। এমন নয় যে, তিনি ইচ্ছা করেই উঠতে চাইতেন না। এ কারণে বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও উম্মাহর প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ করুণা হিসেবে বলেছেন, "হে সাফওয়ান, যখনই ঘুম থেকে উঠবে তখনই সলাত আদায় করে নেবে।" তার পরিস্থিতি এমন ব্যক্তির মতো ছিল, যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সে কারণে পরে জাগতে পারে না। সম্ভবত সাফওয়ানের সাথে মাঝে মাঝে এটা ঘটত। হয়তো তাকে জাগ্রত করার জন্য কেউ থাকত না। ('আউনুল মা'বুদ থেকে সংক্ষেপিত)

২. আহমাদ (৩/৮০, ৮৫), আবু দাউদ (২৪৫৯)

৩. বুখারী (৫২৪০, ৫২৪১), আবু দাউদ (২১৫০) এবং আহমাদ (১/৩৮৭, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪৩)

শয়তান তার কল্পনায় সব সময় ওই নারীর ছবি এঁকে রাখে। এমনকি সে যখন স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটায়, তখনো তার কথা ভাবে। ধীরে ধীরে সে তার স্ত্রীকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তালাক দেবার অজুহাত খুঁজতে থাকে। তার সাথে ঝগড়া করে, অন্যের কাছে তার দোষ বলে বেড়ায়। এসবের শুরুটা হয়েছিল স্ত্রীর কাছে অপর নারীর রূপ-সৌন্দর্য শোনা থেকেই।

এমনকি সন্তান থাকলে তাকেও সে অবহেলা করতে শুরু করে। সমস্যা যত গভীর হতে থাকে, জীবন তত অসহ্য হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক, মানসিক ও সামাজিক কারণে সে স্ত্রীকে বলতে পারে না, সে সে-ই নারীর প্রেমে পড়েছে। নিজের অনুভূতিকে চেপে রেখে পরিবারের শান্তি নষ্ট করার উপায় খুঁজতে থাকে। তাদের সংসার দুনিয়ার বুকে জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়।

একইভাবে ইসলামে অন্যের কাছে নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্যের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তিজানি তার তুহফাতুল 'আরুসে একটি কাহিনি বর্ণনা করেছেন। মা'বাদ আস-সালিতি নামে এক লোক বসরায় বাস করত। তার ছিল এক সুন্দরী স্ত্রী, নাম হামিদা।

মা'বাদকে খোরাসান অভিমুখে এক সেনাদলের সাথে পাঠানো হলো। যাত্রাপথে সে তার সাথিদের কাছে তার স্ত্রীর ব্যাপারে বলতে লাগল। তার সৌন্দর্যের কথা বলল, তার প্রতি তার আকুল ভালোবাসার কথা গল্প করল—ভালোবাসার টানে তার সেনাদল ছেড়ে বাড়িতে পালিয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

মা'বাদের কথা শুনে তার স্ত্রীর ব্যাপারে হুত বিন সিনান নামের এক লোকের মনে আগ্রহ জেগে উঠল। সে মা'বাদকে বলল, "আমি বসরায় যাব ভাবছি।" মা'বাদ বলল, "তাহলে আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি, আমার স্ত্রীকে দিয়ো।" হুত বসরায় পৌঁছানোর সাথে সাথে চিঠি নিয়ে হামিদার বাড়িতে গেল।

তার উদ্দেশ্য ছিল হামিদাকে দেখা। তাই চিঠি সে অন্য কারও হাতে দিতে চাইল না। বলল, "কেবল হামিদার হাতেই আমি এটা দিতে পারব।" অবশেষে হামিদা তার সাথে দেখা করল। কথায় কথায় হুতের মনের কামনার একাংশ হামিদার মনেও সংক্রমিত হলো।

হামিদার সাথে সে যত দেখা করতে লাগল তাদের মধ্যে আকর্ষণ ততই বাড়তে লাগল। অবশেষে দুজনে পালিয়ে গেল। এক বছর তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল

না। একদিন হামিদার পরিবার গর্ভবতী হামিদাকে খুঁজে পেল।

তার এ অবস্থার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 'আবদুর-রহমান বিন 'উবাইদ আল-'আবসি তাকে গ্রেফতার করল। তার অপরাধ প্রমাণিত হলো। ব্যভিচারের অপরাধে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা বাইরে প্রকাশ করা

আবু সা'ঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম—যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেয়।"[১]

আবু সা'ঈদ রা. থেকে আহমাদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"'আশ-শিআ' (কারও অন্তরঙ্গ বিষয় প্রকাশ করা) নিষিদ্ধ।"[২]

আবু সা'ঈদ রা. থেকে আল-খাত্তাবি উল্লেখ করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আশ-শিআ' নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "'আশ-শিআ' হচ্ছে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বড়াই করা, নিজেদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা বলে বেড়ানো।"[৩]

পুরুষেরা সেসব নারীদের পছন্দ করে, যারা গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। আর গোপন বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শয়নকক্ষে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো। পুরুষমাত্রই চায়, তার স্ত্রী এই বিষয়গুলো গোপন রাখুক। শারীরিক সম্পর্কের কথাই হোক আর এর প্রস্তুতিমূলক শুরুর দিকের কথাই হোক—সবকিছুই যেন শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গোপন থাকে।

---

১. মুসলিম (১৪৩৭), আহমাদ (৩/৬৯), আবু নুআ'ইম (১০/২৩৬), বায়হাকী (৭/১৯৩, ১৯৪), ইবনে আস-সুন্নী (৬১৪)

২. মুসনাদ আহমাদ (৩/২৯) এবং মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ (৪/২৯৫)। আবু সা'ঈদ রা. বলেন, 'এটির সনদে দারাজ আছে। ইবনে মু'ইন তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, কিন্তু কিছু আলেম তাকে দুর্বল বলেছেন।'

৩. তুহফাতুল 'আরুস (পৃ. : ৮৮) এবং ফাতহুর রব্বানী তারতীব মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বল (১৬/২২৩)

পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা

বিয়ের শুরুর দিকে স্ত্রীর লাবণ্যময়ী চেহারা পুরুষকে বারবার আকৃষ্ট করে। অথচ দুঃখের সাথে দেখা যায়—সময়ের সাথে সাথে অনেক নারীই এ কথা ভুলে যায়। সাজসজ্জাকে আর গুরুত্ব দেয় না। নিজেদের যত্ন নেওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। স্বামী কাজ থেকে ফিরে স্ত্রীকে অবিন্যস্ত চুল আর জীর্ণ-শীর্ণ পোশাকে দেখে। তার শরীর থেকে সুবাসের বদলে ভেসে আসে রান্নার বিদঘুটে গন্ধ। এভাবে যত দিন যায়—স্ত্রী স্বামীর সামনে সুরুচি ও সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে।

বরং একজন আদর্শ স্ত্রী নিজেকে স্বামীর সামনে ভালোভাবে উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করে। নিজে যেমন পরিচ্ছন্ন থাকে, তেমনি বসবাসের ঘরও পরিষ্কার-গুছিয়ে রাখে। পরিচ্ছন্নতা তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়। অপরিচ্ছন্ন ঘরে মানুষ গোছানো থাকতে পারে না। ঘর ও শরীর দুটোই পরিচ্ছন্ন-গোছানো রাখা একে অপরের পরিপূরক।

অন্যদিকে অপরিপাটি স্ত্রী খুব দ্রুত স্বামীর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেশ অবাক লাগে, কিছু মহিলা ঘরের বাইরে তার সবচেয়ে ভালো পোশাক ও মূল্যবান অলংকার পরে বের হয়; অথচ ঘরে স্বামীর জন্য ভালো কিছু পরে না। তার বিষয়টিও একই রকম আশ্চর্যের, যে ঘরেই থাকে অথচ নোংরা চুল বা অপ্রীতিকর গন্ধ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে না।

স্বামীর সামনে নিজেকে সর্বোত্তমরূপে উপস্থাপন করা স্ত্রীর জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য লম্বা সফর থেকে এসে না জানিয়ে স্ত্রীর কাছে যেতে রসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেন, “অপেক্ষা করো, সন্ধ্যায় যেয়ো সবাই। এতে এলোকেশী নারী চিরুনি করে নিতে পারবে, অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারবে।”[১]

আল-ফাতহ গ্রন্থে হাফিজ বলেন, “এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, অপ্রত্যাশিতভাবে স্ত্রীর কাছে পুরুষের যাওয়া অনুচিত, বিশেষত যখন স্ত্রী অপরিচ্ছন্ন বা অপরিপাটি অবস্থায় থাকে। এতে হয়তো সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে যা দেখে

১. বুখারী (৫২৭৪), ইবনে হিব্বান (৪১৭০)

নিজেই বিরক্ত হবে।”

কোনো কোনো মহিলা মাসিকের সময় এলে স্বামীকে জানিয়ে দেয় পরবর্তী এক সপ্তাহ সে পরিচ্ছন্ন ও সেজেগুজে থাকতে পারবে না। তারা ভাবে, এটা তো অপরিচ্ছন্নতারই সময়। এ সময় স্বামী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে না—তাই বিনা সাজগোজে অগোছালো-অপরিচ্ছন্ন থাকাটাই স্বাভাবিক ভেবে বসে। এটা তাদের ভুল ভাবনা। এই বিরতিতে স্বামী তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাই এ সময় শারীরিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে তাদের আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে। ফলে মাসিকশেষে পবিত্র হয়ে আসার পর তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো নতুন উদ্যমে আরও আনন্দদায়ক রূপ লাভ করবে।

একদিন এক আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে মাসিক শেষ হওয়ার পর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গোসলের পদ্ধতি বললেন। এরপর একটি সুগন্ধিযুক্ত তুলার টুকরো ব্যবহার করতে বললেন (এর দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করলে মাসিকের কারণে কোনো দুর্গন্ধ থাকলে তা দূর হয়)।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এর (তুলার টুকরো) দ্বারা পবিত্র হও।”

মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, “আমি কীভাবে এর দ্বারা পবিত্র হব?”

তিনি ﷺ বললেন, “এর দ্বারা পবিত্র হও।”

মহিলাটি আবার জিজ্ঞাসা করল, “হে আল্লাহর রসূল, কীভাবে এর দ্বারা পবিত্র হব?”

তিনি ﷺ বললেন, “সুবহানাল্লাহ! তুমি এর দ্বারা পবিত্র হও।”

আয়িশা রা. বলেন, “তখন আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বললাম, এটা দ্বারা অমুক অমুক স্থান পরিষ্কার করো, আর রক্তের কোনো চিহ্ন থাকলে মুছে ফেলো।”[১]

পরিচ্ছন্নতার এই উপদেশ শুধু হায়েযের ক্ষেত্রে নয়; বরং সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ধরে রাখতে বাজারে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

১. বুখারী (৩১৪), মুসলিম (৩৩২), আবু দাউদ (৩১৪-৩১৬), আন নাসাঈ (১/১৩৫-১৩৭), ইবনে মাজাহ (৬২৪), দারিমি (৭৭৩) এবং আহমাদ (৬/১২২, ১৪৭, ১৮৮)

এসবের মাধ্যমে নারীর জন্য পরিচ্ছন্ন থাকা ও আকর্ষণীয় হওয়া অনেক সহজ এখন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নারীর সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। এর দ্বারা সাধারণ সৌন্দর্যের একজন নারীও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে অপরিচ্ছন্নতা নারীর সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। পরিচ্ছন্নতার অভাবে সুন্দরী নারীকেও অনাকর্ষণীয় দেখায়।

তা ছাড়া সত্যিকার সৌন্দর্য তো শুধু বাহ্যিক অবয়বে থাকে না; বরং ব্যক্তির চরিত্র, জীবনাচরণ ও অন্তরের পবিত্রতার ভেতরও ফুটে ওঠে। তাই ইসলাম আমাদের আত্মিক শুদ্ধতা ও বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা দুটিই বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। এ কারণে ইসলামের নির্দেশ হলো নিয়মিত নখ কাটতে হবে, অযাচিত লোম পরিষ্কার করতে হবে, সপ্তাহে অন্তত একবার গোসল করতে হবে। এ রকম আরও অনেক নির্দেশই রয়েছে।

নারীর কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তার নারীসুলভ প্রাকৃতিক গুণাবলি তাকে তার স্বামীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই নিজের সৌন্দর্য ধরে রাখতে, ঘর পরিষ্কার ও মার্জিত রাখতে তার চেষ্টা করতে হবে। কাজ থেকে ঘরে ফিরে পুরুষেরা এ ধরনের নারীসুলভ পরিবেশই পছন্দ করে।

আসলে সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, সবকিছুকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা নারীর স্বভাবজাত শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। এভাবেই আল্লাহ ﷻ তাদের সৃষ্টি করেছেন। এটা এমন এক শিল্প যা আয়ত্ত করতে যোগ্যতা, রুচি ও অনুশীলন প্রয়োজন।

একজন নারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে একজন 'নারী।' সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা তার এ নারীত্বকেই ফুটিয়ে তোলে। দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য রক্ষায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারী যখন তার নারীত্বকে মূল্যায়ন করে, স্বামীর আকর্ষণ ও সন্তুষ্টির দিকে মনোযোগ দেয়, তার দাম্পত্য জীবন তখন পূর্ণতা লাভ করে।

শুধু তাই নয়, নারীর মনে রাখা উচিত, ঘরের বাইরে অনেক দুশ্চরিত্রা নারী তার স্বামীকে প্রলুব্ধ করার জন্য অপেক্ষা করছে। অন্তত তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা তো করছেই। তাই তার উচিত স্বামীর সামনে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা। নতুবা ঘরের বাইরে মহিলাদের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা তার জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে।

জীবনপথে চলতে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা

স্বামীর সামনে নিজেকে সর্বোত্তমরূপে উপস্থাপন করা নারীর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতার ওপরে আমরা জোর দিয়েছি। তবে সব ক্ষেত্রেই আমাদের প্রান্তিকতা এড়িয়ে চলতে হবে, ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নারীদের উদ্দেশ্য করে আমাদের এতক্ষণ আলোচনার কারণ হলো, নারী-পুরুষের প্রকৃতি। শারীরিক চাহিদার ক্ষেত্রে পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা তাদের সহজাত প্রকৃতি। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রে স্বভাবসুলভ প্রকৃতি হলো তারা আপন সৌন্দর্য বজায় রাখবে। অবশ্য এর অর্থ এমন নয় যে, চেহারার ব্যাপারে পুরুষ নির্লিপ্ত থাকবে; বরং স্বামীকে তার ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ রসূলুল্লাহ ﷺ।

তাঁর চুল থেকে মিশক (সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি) গড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে অথবা ঘুম থেকে উঠে সবকিছুর আগে তিনি মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন। তিনি নিয়মিত চুল আঁচড়াতেন, পরিচ্ছন্ন সাদা জামা পরতেন। তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে আনাস রা. বলেন, "আমি কখনো রসূলুল্লাহর হাতের চেয়ে উত্তম (উত্তম সুগন্ধিযুক্ত সম্ভবত) বা নমনীয় হাত ছুঁইনি।"

অথচ অনেকে ভুলবশত সন্ন্যাস-জীবনকে প্রশংসনীয় ভাবে। তাদের কাছে নোংরা-মলিন জীবনযাপন এক ধরনের ইবাদাত। অজ্ঞতার কারণে কতটা ভ্রান্তির মাঝে থাকে তারা!

উম্মাহর উজ্জ্বল নক্ষত্র ইবনে আব্বাস রা. আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর জন্য সাজগোজ করতেন। তাঁর এ অভ্যাসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি স্ত্রীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, "আর নারীদের ওপর তাদের স্বামীদের যেরূপ অধিকার আছে, স্ত্রীদেরও পুরুষদের (স্বামীর) ওপর সেরূপ ন্যায়সংগত অধিকার আছে। তাদের ওপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব।"'[১]

---

১. আল-কুরআন, ২ : ২২৮

স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা

সুস্থ চিন্তার কোনো পুরুষ স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারে না। 'আবদুল্লাহ বিন যাম'আহ রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের মতো মেরো না। কেননা, দিনশেষে তার সঙ্গেই তো শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গ হবে।"[১]

স্ত্রীকে মারধর করে তার সাথেই আবার শারীরিক অন্তরঙ্গতায় লিপ্ত হওয়া কতটা পাশবিক ভেবে দেখুন! এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রী মন থেকে তার সাথে অন্তরঙ্গ হতে পারবে না। মানুষের প্রকৃতিই হলো তাকে আঘাত করা হলে সে দূরে সরে যায়; বরং স্ত্রীর সাথে নরম ব্যবহার করা উচিত। এতে সম্পর্ক তো ভালো থাকেই—অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোতেও সে নিজে থেকে আগ্রহী থাকে। ফলে তারা আরও আনন্দদায়ক সময় কাটায়।

অবাধ্য হলে স্ত্রীকে হালকাভাবে আঘাত করার অনুমতি স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। তবে এর মাত্রা এতটাই কম হতে হবে যেন স্ত্রী ঘৃণাভরে তার থেকে দূরে সরে না যায়। আর কঠোরভাবে আঘাত করার তো প্রশ্নই আসে না। বরং সর্বোত্তম হলো, স্ত্রীকে তার মন্দ আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করা, সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া। আল্লাহ ﷻ বলেন,

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ... ﴿٣٤﴾

"নারীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করলে তাদের সদুপদেশ দাও, (এতে কাজ না হলে) বিছানা থেকে আলাদা করো, (এতেও কাজ না হলে হালকাভাবে) আঘাত করো। কিন্তু তারা তোমাদের অনুগত হলে তাদের জন্য অন্য পথ বেছে নিয়ো না।"[২]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ শুনে নাও, তারা তো তোমাদের কাছে বন্দিনীর মতো। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা এমনটা করে, তবে তাদের পৃথক বিছানায় রাখবে—(প্রয়োজনে) আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে।

১. বুখারী (৫২০৪), ইবনে হিব্বান (৪১৭৮), আহমাদ (৪/১৭) এবং ইবনে মাজাহ (১৯৮৩)
২. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

কিন্তু তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে আর বাড়াবাড়ি কোরো না।”[১]

এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। তিনি ﷺ কখনোই তাঁর কোনো স্ত্রী বা খাদেমকে আঘাত করেননি।[২]

নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ

নারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হলো নিজের সন্তান নিজেই মানুষ করা—চাকরবাকরের কাছে, ডে-কেয়ারে কিংবা অন্য কারও ওপর সন্তান পালনের দায়িত্ব না দেওয়া। মুসলিম সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে। নারীর গুরুদায়িত্ব হলো তার সন্তানকে সৎকর্মশীল মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“নারী তার স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।”

একমাত্র মা-ই সন্তানকে যথার্থ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে পারেন। জন্মের পর থেকে মা বাচ্চার যত্ন ও পরিচর্যা করেন। এরপর ভালোবাসা ও মমতায় শিশুকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন—যা তাকে সমাজের সুস্থ-স্বাভাবিক-সফল সদস্য হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। অন্যদিকে নার্সারি বা ডে-কেয়ারগুলোতে শুধু পয়সাই খরচ হয়, কিন্তু এসবের কোনোটিই তারা দিতে পারে না। এজন্য বাবা-মায়ের হাতে বেড়ে ওঠা প্রত্যেক শিশুর জন্মগত অধিকার।

আমরা বলছি না যে, মুসলিম সমাজে ঘরের বাইরে নারীদের কোনো ভূমিকা নেই; বরং কার্যকর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে যোগ্য নারীদের বিভিন্ন পেশায় প্রয়োজন—এমনসব পেশা যা তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও নারীত্বের সাথে মানানসই। ঘরের বাইরে তাদের দায়িত্ব পালন সহজ করতে সমাজে সেরূপ আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন : স্কুল-কলেজে তাদের শিক্ষক হিসেবে কম চাপে রাখা, অফিস বা হাসপাতালে তাদের কাজের সময় কম রাখা ইত্যাদি। এ ছাড়াও তাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ঐচ্ছিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, ফলে তারা পারিবারিক দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে শিখতে পারবে।

---

১. ইবনে মাজাহ (১৮৫১)

২. মুসলিম (২৩২৮), ইবনে মাজাহ (১৯৮৪), দারিমি (২২১৮) এবং আহমাদ (৬/২২৯, ২৩২)

লক্ষ রাখতে হবে, নারীর কর্মক্ষেত্রে যেন ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশার কোনো সুযোগ না থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতির দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে—কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য স্থানে এ ধরনের মেলামেশা সমাজের নৈতিকতাকে কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। পশ্চিমারা নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিয়ে গর্ব করে। অথচ তাদের সমাজে যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের মাত্রা আকাশছোঁয়া। সেখানে আছে প্রচুর একাকী মা যারা সন্তানের জন্য যথেষ্ট আয় করতে পারে না। সেখানে ডিভোর্সের হার সর্বোচ্চ। শিশুরা পরিবারে খুব কমই শেখে; বরং রাস্তায় বন্ধুবান্ধবের দেখাদেখি শেখে, তাদের সাথেই বড় হয়।

পশ্চিমারা যে নারী স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করে, তা আসলে মিথ্যে মুখোশ। তাদের অনেকে হয়তো একাকী মায়ের মতো সমাজের দাসী হওয়া থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা থেকে বাঁচতে পারে না—বিয়ের কোনো আশা ছাড়াই তারা একের পর এক অস্থায়ী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি পেশাগত জীবনে সফল হলেও সে সফলতার জন্য তাকে চড়া মূল্য হিসেবে দিতে হয় তার নারীত্ব; বিবাহিত জীবন ও বাচ্চা গর্ভে ধারণ করার সময়ও তার নেই। অনেকে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও মানুষ করার সময় পায় না।

আমাদের কাছে আদর্শ হচ্ছেন সেই মুসলিম নারী, যিনি সন্তান লালনপালন ও মানুষ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শিশুরা মায়ের যত্নের কাঙাল। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ রা.-এর কথা ভাবুন। তিনি কুমারী নারীকে বিয়ে না করে এক বয়স্কা বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কুমারী বিয়ে করলে না কেন?"

জাবির রা. উত্তরে বললেন, "'আবদুল্লাহ (তার বাবা) কন্যাসন্তানদের রেখে মারা গিয়েছেন। তাই এমন কাউকে আনতে চাইলাম না, যে (বয়স, পরিপক্বতা ও অভিজ্ঞতায়) তাদের মতোই। আমি এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি, যে তাদের প্রতি দায়িত্বশীল হবে ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবে।"

এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ ﷻ তোমাকে বারাকাত দিন" অথবা বললেন, "আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন"।[১]

১. বুখারী (৫৩৬৭)

শ্বশুরবাড়িতে ভারসাম্য রক্ষা

সম্মানিত বোন, আপনার প্রিয়তম-সম্মানিত স্বামীকে বড় করে তোলার কারণে আপনার শাশুড়ির কাছে আপনি ঋণী। তবে আপনি ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন, তার প্রতি দায়িত্ব পালন করা কতটা কঠিন ও ক্লান্তিকর।

আপনার স্বামী এবং আপনি—দুজনেই তার কাছে ঋণী। তিনি ক্লান্তিকর নয়টি মাস আপনার প্রিয়তমকে পেটে রেখেছেন। তাকে জন্ম দেবার সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছেন। এরপর তাকে খাইয়ে, যত্ন নিয়ে বড় করেছেন—তার শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তার কষ্টের কোনো কমতি তিনি করেননি। সন্তানের বিশ্রামের জন্য তিনি ক্লান্তিকে মেনে নিয়েছেন, তার জন্য ক্ষুধার্ত থেকেছেন, সারা রাত জেগেছেন যেন সে ঘুমাতে পারে। এককথায়, প্রয়োজনীয় সব দিক দিয়ে তিনি আত্মত্যাগ করেছেন যেন তার সন্তান একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আপনি এখন তার পরিশ্রমেরই ফসল ভোগ করছেন।

আপনার স্বামীর শৈশবকাল থেকেই তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করেছেন। সেই দিনের অপেক্ষা করেছেন যখন তার ছেলে বড় হবে, সুখী পরিবার নিয়ে বাকিটা জীবন কাটাবে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তার সন্তান একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী পাবে—যে তাকেও সম্মান করবে। এরপরও কি তার প্রতি নিজের দায়িত্বগুলো পালন করতে আগ্রহী হবেন না? এরপরও তাকে অবহেলা করা থেকে বিরত হবেন না? আল্লাহ ﷻ আপনাকে হেদায়েত দিন, হেফাজত করুন।

হে আমার ঈমানদার বোন, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি তো সে-ই পায়, যে নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপরের জন্যও তা-ই ভালোবাসে। আপনি সন্তান পাবার আশা করেন। ছেলেসন্তানের জন্য আপনার আশাগুলো ঠিক আপনার শাশুড়ির আশাগুলোর মতোই—যা তিনি বহুদিন ধরে লালন করেছেন। তার ইচ্ছাগুলো পূরণের চেষ্টা করুন, যেভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা পূরণের আশা করেন।

জেনে রাখুন, আপনার ওপর আপনার স্বামীর সবচেয়ে বড় অধিকারগুলোর একটি হচ্ছে আপনি তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা, বিশেষ করে মায়ের ক্ষেত্রে। আপনি অবশ্যই তাকে এ দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেবেন, পালন করতে সাহায্য করবেন।

তাকে সাহায্য করলে আপনি এমন একজন স্বামী পেয়ে সুখী হবেন যার জীবন ও সম্পদে আল্লাহ ﷻ রহমত নাজিল করেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে, তার জন্য তুবার[১] সুসংবাদ! আল্লাহ তার হায়াত বাড়িয়ে দেবেন।"[২]

সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সৎকর্ম ছাড়া অন্য কিছুতে হায়াত বাড়ে না, দু'আ ছাড়া অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষ তার পাপকাজের কারণে তার প্রাপ্য রিযক থেকে বঞ্চিত হয়।"[৩]

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি চায় তার রিযক প্রশস্ত হোক ও আয়ু বেড়ে যাক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে।"[৪]

তাই আপনার স্বামীকে তার বাবা-মা ও আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনে সাহায্য করুন। তাকে আলী রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিসটির কথা মনে করিয়ে দিন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার উম্মত যখন পনেরোটি বিষয়ে লিপ্ত হবে, তখন তাদের ওপর বিপদ-মুসিবত এসে পড়বে।" আর সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, "পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, কিন্তু তার মায়ের অবাধ্য হবে। বন্ধুর সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিন্তু বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করবে।"[৫]

মনে রাখবেন, আপনি মা হলে আপনিও আপনার সন্তান থেকে আনুগত্য ও সম্মান আশা করবেন। হাদিসে এসেছে, "তোমার বাবার প্রতি দায়িত্বশীল হও, তোমার সন্তানও তোমার প্রতি দায়িত্বশীল হবে।"[৬]

---

১. জান্নাতের একটি নাম কিংবা জান্নাতের একটি গাছ।

২. সাহল বিন মু'আয থেকে হাকিমে (৪/১৫৪) বর্ণিত। হাকিম একে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন : আয-যাওয়া'ইদ (১/১৪০)।

৩. আহমাদ (৫/২৭৭, ২৮০, ২৮২), ইবনে মাজাহ (৪০২২), হাকিম (১/৪৯৩), ফাইদুল কাদীর (২/৩৩৩)। আল-মানাউই একে সহীহ বলেছেন।

৪. আহমাদ (৩/২২৯, ২৬৬), এই হাদিসটি আয-যাওয়া'ইদেও (৮/১৫৬) বর্ণিত হয়েছে। এর রাবীগণ একে সহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসটি বুখারী (৫৯৮৬) ও মুসলিমেও (২৫৫৮) পাওয়া যায়, কিন্তু পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীলতার অংশটুকু নেই।

৫. তিরমিজিতে (২২১০) বর্ণিত। এর মান 'গারীব।'

৬. হাকিম (৪/১৫৪), আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। হাকিমের মতে, হাদিসের মান সহীহ। আয-যাহাবী দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'এর রাবীগণের মাঝে সুওয়াইদ আছে। সে দুর্বল।' তাবারানি তার আল-আওসাতে এটি বর্ণনা করেছেন, তেমনি মাজমা' আয-যাওয়া'ইদেও ইবনে 'উমার রা.-এর থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আত-তারগীবে (২/২১৫) আল-মুনযিরি একে 'হাসান' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আপনার শাশুড়ি ও অন্য বৈবাহিক আত্মীয়ের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন :

- আপনার শাশুড়ির সাথে এমন ব্যবহার করুন, যেমনটি আপনার মায়ের সাথে করে থাকেন। তিনি আপনার স্বামীকে জন্ম দিয়েছেন, বড় করেছেন, পরিণত মানুষরূপে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। হতে পারে তিনি প্রথমদিকে আপনার সাথে কঠিন আচরণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনার চরিত্রের ভালো দিক, যেমন ধৈর্য ও কোমলতার দ্বারা তার শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা করুন। বয়সে বড় হওয়ার কারণে তিনি আপনার সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখেন।

- শ্বশুর-শাশুড়িকে ডাকার সময় আদর করে "আব্বা-আম্মা" বা "আব্বু-আম্মু" বলে ডাকুন। এমন আচরণ তাদের মন গলিয়ে দিতে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলে। তারা আপনার আত্মীয়। শরীয়তে তিন ধরনের সম্পর্ককে আত্মীয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়, দুধপান-সম্পর্কের আত্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়।

- শাশুড়ির মন জয় করার জন্য তার প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। ঘনঘন তার খোঁজখবর নিন, নিয়মিত তার সাথে দেখা করুন, তিনি পছন্দ করেন এমন কিছু উপহার দিন, তিনি তার ছেলের কাছে কী কী চাচ্ছেন সেসব জানার চেষ্টা করুন। এতে তিনি যেমন আপনার চেষ্টা দেখে আপনার ভালোবাসা অনুভব করবেন, তেমনি আপনার স্বামীও আপনার ওপর খুশি হবেন; আপনার বাবা-মায়ের প্রতিও তিনি একই ধরনের সম্মান দেখাবেন।

- সব সময় আপনার স্বামীকে তার বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল থাকার কথা মনে করিয়ে দিন।

- আপনার শাশুড়ির সাথে দেখা করতে গেলে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, আপনি মেহমান নন। সাধারণত অন্য মেহমানদের খাতির-যত্ন করতে যেসব ঝক্কি-ঝামেলা তাকে পোহাতে হয় সেসব থেকে তাকে দূরে রাখুন। আপনি তার পরিবারেরই একজন। চা-নাস্তা আপনিই বানিয়ে দিতে পারেন, অন্তত বানাতে সাহায্য করতে পারেন।

- শাশুড়ির সাথে শ্রদ্ধা বজায় রেখে কথা বলুন। তিনি পাশে না থাকলেও তার ব্যাপারে কথা বলার সময় সম্মান বজায় রাখুন।

- তার রান্না ও পরিবার সামলানোর দক্ষতার প্রশংসা করুন। তবে অভিনয় করে অবান্তর প্রশংসা করতে যাবেন না যেন।

- ঘর সামলানো বা ব্যক্তিগত বিষয়ে তার উপদেশ নিন। এতে তিনি বুঝতে পারবেন, আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার উপদেশ পালনের মাধ্যমে তাকে সম্মান দেখান। অবশ্য সে উপদেশ আপনার কোনো সমস্যার কারণ হলে ভিন্ন কথা।

- আপনাদের দাম্পত্য জীবনের বাদানুবাদের মাঝে তাকে টেনে আনবেন না। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। আপনাদের নিজেদের মধ্যকার কোনো বিবাদের কথা জেনে যদি তিনি আপনার স্বামীর পক্ষ নেন, তবে ধৈর্য ধরুন। মনে রাখবেন, সবার আগে তিনি একজন মা।

- অন্যদের সামনে তার সুনাম করুন। এমনটা অহরহ দেখা যায়, গল্পের আসরে অনেকেই শাশুড়ির দুর্নাম করার সুযোগ খোঁজে। এমন কাজে গীবত তো হয়ই, পাশাপাশি শাশুড়ি ও স্বামীর সাথে আপনার দুর্বল সম্পর্কের কথাও অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়।

- মাঝে মাঝে আপনার শাশুড়ি ও অন্যান্য আত্মীয়দের বাসায় দাওয়াত দিন।

- তার ভুলগুলো এড়িয়ে চলুন। আপনার বাসায় তিনি এলে তাকে বোঝা মনে করবেন না। এ রকম কিছু মনে এলে তার প্রতি দয়া দেখানোর কারণে আল্লাহ ﷻ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন—এরূপ ইতিবাচক চিন্তা করুন। যত বেশি দিন সম্ভব তিনি যেন আপনাদের সাথে সময় কাটান সে অনুরোধ করুন।

- এমন আচরণ করুন যা দেখে আপনার সন্তান তাদের দাদা-দাদি ও নানা-নানিকে ভালোবাসে। সন্তানদের শেখান কীভাবে তাদের ভালোবাসতে ও সম্মান করতে হয়। বাবা-মায়ের সাথে আপনার আচরণ দেখে তারা শিখবে কীভাবে তারা আপনাদের সাথে আচরণ করবে।

- সাবধান! আপনার স্বামীর সামনে শাশুড়িকে অথবা শাশুড়ির সামনে স্বামীকে

বিদ্রুপ করবেন না!

- আপনার ননদ বেড়াতে এলে—সেটা যদি লম্বা সময়ের জন্যও হয়—সম্মানিত মেহমান হিসেবে তার দেখভাল করুন। সব সময় তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন, হাসিমুখে কথা বলুন। তার সাথে খোলামেলা হোন, যেন সে আপনার বোনের মতো হয়ে ওঠে।

- অনেক বৈবাহিক সমস্যার শুরুটা হয় এভাবে, প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ির মানুষের সাথে স্ত্রীর মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। এ সময় তাদের কেউ হয়তো অনুচিত কিছু একটা বলে বা করে বসে। বুদ্ধিমতী নারী এ ক্ষেত্রে নিজের রাগ সংবরণ করে তাদের ব্যবহারের স্বপক্ষে কোনো অজুহাত খুঁজে নেয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের কাজের জন্য কখনোই নিজ স্বামীকে দোষী ভাবতে যাবেন না।

বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা

জীবনের সব স্তরেই মানুষের সৎসঙ্গের প্রয়োজন। বিশেষত বিয়ের প্রথম বছরগুলোতে একজন স্ত্রীর দ্বীনদার সঙ্গিনী দরকার। এ সময় নববধূর বয়স যেমন কম থাকে, তেমনি সে অনভিজ্ঞ ও অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকে। তাই তাকে খুব সাবধানে সঙ্গিনী নির্বাচন করতে হবে। মন্দ বা নিপাট মূর্খ বান্ধবী হয়তো বলে বসতে পারে, "তোমাদের বিয়ের এক বছর হয়ে গেল, অথচ এখনো তোমরা ভাড়া বাসায় থাকো! তোমাকে বাড়ি কিনে না দেওয়া পর্যন্ত স্বামীকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না।"

আবার এমনও বলতে পারে, "তোমার স্বামীর কাছে কিছু চেয়ে না পেলে রাগের ভান করবে। তাহলে সে যেভাবেই হোক তোমাকে খুশি করার জন্য ছুটে আসবে।" এ রকম আরও অনেক কিছুই বলতে পারে। এ ধরনের কথা শুনতে গিয়ে অনেক নারীই পরিবারে দুর্দশা ডেকে আনে।

নববধূকে এমন নারীদেরকেও এড়িয়ে চলতে হবে, যারা অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলায়—প্রশ্ন করে বসে, "তো তোমার শাশুড়ি কেমন মানুষ?" বা "তোমার স্বামী তোমাকে হাতখরচের জন্য কত টাকা দেয়?" কিংবা কথা বের করার উদ্দেশ্যে বলে, "তুমি তো তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ব্যাপারে অনেক ধৈর্যশীল! তাদের সাথে চলা আসলেই খুব কঠিন! তাই না?"

এমন ধার্মিক-দ্বীনদার নারীদের সাথে মিশুন যারা এ-জাতীয় তুচ্ছ বিষাক্ত কথা বলে না। বরং ইবাদাত ও আখিরাতের কথা বলে, কীভাবে একজন ভালো মুসলিম হওয়া যায় সে বিষয়ে ফিকির ও আলোচনা করে।

বাসায় কাজের মহিলা রাখা

ধনী পরিবারে সচরাচর কাজের মহিলা দেখা যায়। আজকাল তুলনামূলক গরিব দেশ বা যেসব দেশে বাইরে থেকে কম মূল্যে শ্রমিক আনা হচ্ছে সেখানেও মধ্যবিত্ত পরিবারে এমনটা দেখা যাচ্ছে। ঘর পরিষ্কার করা, গাড়ি চালানো, বাচ্চা দেখাশোনা করা বা ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে কাজের লোক রাখার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বিভিন্ন কারণে বাসায় কাজের মেয়ে রাখা উচিত নয়। অনেক নারী বাসার বাইরে কাজ করেন। তারা বাচ্চা দেখাশোনার জন্য আয়া ভাড়া করেন। ঠিক যে সময়টাতে মায়ের কাছে শিশুর দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষা দরকার, সেই সময় তাকে এমন আয়ার হাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যে হয়তো কোনো দ্বীনদার মুসলিম নয়। মায়ের অনুপস্থিতিতে আয়া যা খুশি তা-ই বাচ্চার সাথে করতে পারে। এভাবে বাচ্চা তার সাথে সারাদিন কাটায়, তার চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর আয়া যদি অমুসলিম হয় তবে তো শিশুর ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য সে-ই যথেষ্ট।

প্রথম দিকের বছরগুলোতে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ও লালনপালন করার দায়িত্ব তার পরিবারের, বিশেষ করে তার মায়ের। একদম অপরিচিত কারও হাতে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়।

বাসায় কাজের মেয়ে রাখার বিপদ হয়তো আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। নারী বছরের পর বছর সফল দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে, তার সব দায়িত্ব পালন ও বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করে হয়তো একসময় আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে; ফলে স্বামীর জৈবিক চাহিদার কথা আর তেমন চিন্তা করে না। আবার তার স্বামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারে না।

এই পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করতে বাসায় কমবয়সী কাজের মেয়ে বড়ই বিপজ্জনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেয়েরা হয় দুর্বল, দরিদ্র ও খোলামেলা আচরণের। ধরে নিচ্ছি, স্বামী হয়তো বেশ দ্বীনদার মানুষ, তাই এই প্ররোচনা থেকে তিনি নিজেকে

বাঁচিয়ে রাখতে পারেন; স্ত্রীর চাপে তাকে বাসায় বাধ্য রেখেছেন। কিন্তু তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলের কথা ভাবুন। সে তো বাসায় তার দিনের বেশির ভাগ সময় কাটায়। অনেক সময় সে একাই বাসায় থাকে, আর থাকে সেই কাজের মেয়েটি। সেই ছেলের কী হবে?

আমার কথা একটু ফিরিয়ে নিচ্ছি—ছেলেটি তার সাথে একা থাকে না, তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান সেখানে থাকে। তাই পরিবারের পুরুষদের খাতিরে বাসায় কাজের মেয়ে না রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন। পরিবারের মঙ্গলের জন্যই পাপের লোভনীয় সকল পথ বন্ধ রাখতে হবে। কাজের মেয়ে যদি একান্তই রাখার প্রয়োজন পড়ে, তবে প্রথম থেকেই এমনভাবে চলতে হবে যেন পাপের কোনো পথ খোলা না থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে তাকে কাজ থেকে বাদ দিতে হবে।

বাইরে পোশাক পরিবর্তন করা

কিছু নারী দ্বীনদার মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অন্য নারীর উপস্থিতিতে জামা পরিবর্তন করে। কোনো পুরুষ নেই এই অজুহাতে তারা আক্ষরিক অর্থেই অন্য মেয়ের সামনে জামা বদলায় কিংবা আঁটসাঁট-স্বচ্ছ-অশালীন পোশাক পরে। অনেকে পুরো বিবস্ত্র হতেও লজ্জাবোধ করে না। অনেকে তো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে পশ্চিমা মেয়েদের পোশাক পরতে দ্বিধাবোধ করে না।

এটা সত্য যে, অন্য নারীর সামনে নারীদের "আওরাহ" (শরীরের যে অংশ ঢাকা ফরজ) হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। কিন্তু তাদের এমন কোনো পোশাক পরা উচিত নয় যা তার ব্যাপারে অন্য নারীর কামনা জাগ্রত করে। বিশেষত বর্তমানে যে হারে নারীর প্রতি নারীর আর পুরুষের প্রতি পুরুষের সমকামিতার ফিতনা ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে আরও সাবধান হওয়া সময়েরই দাবি।

একই সাথে আরেকটি বিপদ রয়েছে—নিজের অজান্তেই বাইরের পৃথিবীতে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ার ঝুঁকি। বিষয়টি নিচের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেই শোনা যাক :

"আমি হিজাব পরতাম। আমার স্বামীও দ্বীনদার ছিলেন। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে আমি পোশাকের ব্যাপারে ছাড় দিতাম। অনুষ্ঠানে শুধু মেয়েদের মজলিসগুলোতে

আমি হিজাব খুলে অন্যদের সাথে নাচ-গান করতাম। আমি যথেষ্ট সুন্দরী ছিলাম, রূপের অহংকার করতাম বলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই অন্য মেয়েদের কাছে নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে অনেক ভালো লাগত আমার। তারা বলাবলি করত, 'সে তো নতুন বৌয়ের থেকেও সুন্দর!'

আমার স্বামী আমাকে বারবার বলতেন যেন বাসার বাইরে কখনোই হিজাব না খুলি। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস পর্যন্ত মনে করিয়ে দিতেন,

"যে নারী স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য কোথাও তার পোশাক খুলল, সে তার ও আল্লাহর মাঝের পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলল।"[১]

একদিন আমার স্বামী এক উপসাগরীয় দেশে সফরে গেলেন। এক অফিস ঘুরতে গিয়ে দেখলেন দুই যুবক তুমুল তর্কে লিপ্ত—বিষয় : 'উপসাগরীয় কোন দেশের মেয়েরা দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী?' তাদের একজন প্রমাণ হিসেবে বের করে একটি ভিডিও দেখানো শুরু করল। প্লে বাটনে চাপ দিতেই পর্দায় এক বিয়ের আয়োজনের দৃশ্য ফুটে উঠল। আমার স্বামী হতবাক হয়ে দেখতে পেলেন, ভিডিওতে আমি নাচছি আর গাইছি; আর আমার ওপরের দিক প্রায় অর্ধেকটাই উন্মুক্ত। অফিসের সেই যুবক আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগল। আমার স্বামী তখনই সফর বাতিল করে ফিরে এসে আমাকে তালাক দিলেন।"

অতীত নিয়ে অহেতুক জোরাজুরি

অনেক নারীই স্বামীর অতীতের সবকিছু জানার ব্যাপারে জোরাজুরি করে। এমনটা অনেক সময়ই হয়—স্বামী আগে দ্বীনদার ছিলেন না, পরে দ্বীনের আলো পেয়ে ইসলাম মানা শুরু করেছেন। এখন তার স্ত্রী হয়তো সে সময়ে তার পছন্দের নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বসে, 'তারা দেখতে কেমন ছিল?' বা এই ধরনের কিছু। এমনকি অনেক স্ত্রী শোনার জন্য জেদ ধরে বলে, এসব বললে তার ওপরে কোনো প্রভাব পড়বে না।

যেসব পুরুষ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তারা বেশ বড় বোকামি করে বসে। এর অনেক বড় মাশুল তাদের দিতে হয়। পূর্বের যেকোনো সম্পর্কের স্বীকারোক্তি তাদের

---

১. আহমাদ (৬/৪১), ইবনে মাজাহ (৩৭৫০) এবং হাকিম (৪/২৮৮)। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। হাকিম এবং আয-যাহাবী উভয়েই হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

বিবাহিত জীবনকে ঈর্ষার বিষে বিষাক্ত করে তোলে।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোন, জীবনসঙ্গীর অতীত খোঁজার ব্যাপারে সাবধান হোন! বরং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী মনে রাখুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...﴿١٠١﴾

"হে ঈমানদাররা, তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট দেবে।"[১]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।"[২]

জীবনসঙ্গীর অতীত নিয়ে অহেতুক গবেষণা না করে তার সাথে বর্তমান সময়কে উপভোগ করুন।

সন্দেহ তৈরির সুযোগ না রাখা

সন্দেহ করা থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারে না। সেখানে স্বামী-স্ত্রী যদি এমন আচরণ করে যা সন্দেহজনক, তবে তা পরিবারে অশান্তি বয়ে আনাটাই স্বভাবিক। যেমন : স্বামী তার বন্ধুদের সাথে বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে সময় কাটায়—অনেক স্ত্রীই এটাকে ভালোভাবে নেয় না। তেমনি স্বামীর বন্ধুদের সাথে ফোনে অপ্রয়োজনে বা সাবলীল ভাষায় কথা বলা স্ত্রীর কখনোই ঠিক নয়। এমন কেউ ফোন করলে শুধু প্রয়োজনীয় কথা সেরেই রেখে দেওয়া উচিত।

এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। একবার তিনি তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা.-এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় দুজন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখামাত্রই তারা তাদের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথে বলে উঠলেন,

১. আল-কুরআন, ৫ : ১০১

২. তিরমিজি (২৩১৭), ইবনে মাজাহ (৩৯৭৬)। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

“তোমরা একটু থামো। এটা সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা.।”

তারা বললেন, “সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রসূল (আমরা এ ছাড়া আর কী ভাবতাম)!”

তিনি ﷺ বললেন, “মানুষের রক্তে শয়তান ঘুরে বেড়ায়। আমার ভয় হচ্ছিল, সে তোমাদের মনে কোনো খারাপ ধারণা বা অন্য কিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারে।”[১]

পরিবারের জন্য খরচ করা

স্ত্রীকে তার ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। নিজ সম্পদ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করবেন। এ ক্ষেত্রে অপচয় বা কৃপণতা কোনোটাই করা উচিত নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“তুমি হাত বন্ধ করে রেখো না, একেবারে মুক্তহস্তও হোয়ো না; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।”[২]

তিনি আরও বলেন,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“ধনী তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। যার জীবনোপকরণ সীমিত, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকেই সে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করেন।”[৩]

---

১. বুখারী (৩২৮১), মুসলিম (২১৭৫), ইবনে মাজাহ (১৭৭৯), আবু দাউদ (৪৭১৯), আহমাদ (৬/৩৩৭) এবং ইবনে হিব্বান (৩৬৬৩)। সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা. থেকে বর্ণিত।

২. আল-কুরআন, ১৭ : ২৯

৩. আল-কুরআন, ৬৫ : ৭

পরিবারের জন্য ব্যয় করাকে ইসলামে পুরুষের জন্য ইবাদাত হিসেবে গণ্য করা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"মানুষ তার দিনারগুলোর মধ্যে যেটি তার পরিবারের জন্য খরচ করে, যে দিনারটি সে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তার পশুর জন্য খরচ করে এবং যে দিনারটি সে আল্লাহর পথে তার মুজাহিদ সঙ্গীর জন্য খরচ করে, সেটিই সর্বোত্তম দিনার।"[১]

একজন আদর্শ স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, আল্লাহ ﷻ তাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। বরং খরচ করার ব্যাপারে স্ত্রীকে আরও বিচক্ষণ হতে হবে। ধনী স্বামী তার হাতে প্রচুর অর্থ দিলেও পানির মতো সেগুলো খরচ করা অনুচিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"যে বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করে (অপচয় করে না), সে গরিব হয় না।"[২]

বিচক্ষণ স্ত্রী-মাত্রই জানেন, কীভাবে স্বামীর আর্থিক অবস্থার সাথে নিজের চাহিদার ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। সে বিভিন্ন দাবির বোঝা স্বামীর ওপর চাপিয়ে দেয় না। তার বান্ধবীরা কে কী কিনছে সে কথা শুনিয়ে স্বামীকে খোঁটা দেয় না। মুসলিম পরিবার লোভ আর অসন্তোষের বিষাক্ত বাতাসের বদলে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির শোকরে ভরপুর থাকে।

স্বামী আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলেও স্ত্রীর উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকা, পরিকল্পনা করে খরচ করা। রসূলুল্লাহ ﷺ আবু যার রা.-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

"আবু যার, উত্তম পরিকল্পনার মতো বিচক্ষণতা আর কিছুই নেই।"[৩]

'আবদুল্লাহ বিন 'আমর রা. থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"সে-ই সফলকাম হয়েছে—যে ইসলামের হেদায়াত পেয়েছে, তার প্রয়োজনমাফিক রিযক পেয়েছে ও তাতে আল্লাহ তাকে তুষ্ট রেখেছেন।"[৪]

---

১. মুসলিম (৯৯৪), আহমাদ (৫/২৭৭, ২৭৯, ২৮৪), তায়ালিসি (৯৮৭), তিরমিজি (১৯৬৬), ইবনে মাজাহ (২৭৬০) এবং ইবনে হিব্বান (৪২২৮)। সাওবান রা. থেকে বর্ণিত।
২. আহমাদ (১/৪৪৭)
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়ায় (১/১৬৬-১৬৮) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ। এ হাদিসটি সহীহ ইবনে হিব্বানেও (৩৬২) পাওয়া যায়।
৪. মুসলিম (১০৫৪), তিরমিজি (২৩৪৮) এবং ইবনে মাজাহ (৪১৩৮)

কিছু নারীকে আল্লাহ ﷻ সম্পদশালী স্বামী দান করা সত্ত্বেও তারা বিড়বিড় করে অভিযোগ করতেই থাকে যে, তাদের যথেষ্ট নেই। তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“আল্লাহ তাআলা সেই নারীর দিকে তাকান না, যে তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ; অথচ তাকে ছাড়া তার চলা সম্ভব নয়।”[১]

স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ থাকা স্বামীর দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

“যে ব্যক্তি দুজন স্ত্রীর একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন তার দেহের একপাশ ভাঙা অবস্থায় সে হাজির হবে।”[২] আরেক বর্ণনায় এসেছে, “...একপাশ কাত অবস্থায়।”

রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত কাটাতেন, সমপরিমাণ খরচ করতে, সমপরিমাণ কাপড় কিনে দিতেন। এককথায়, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ থাকতে যা কিছু করা সম্ভব তিনি তা-ই করতেন। আর বলতেন,

“হে আল্লাহ, এ হলো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ। অতএব যে বিষয়ে তোমার ক্ষমতা আছে, অথচ আমার সামর্থ্য নেই, সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার কোরো না।”[৩]

এখানে মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ অন্তর ঝুঁকে পড়ার কথা বলেছেন, যার ওপর মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্যদিকে সমান অধিকার রক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়, যা মানুষের সম্পূর্ণ এখতিয়ারে থাকে।

শুধু স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; সন্তানদের মাঝেও সমতা বিধান করতে হবে। যে স্বামী এক স্ত্রীর সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত উদার আর অন্য স্ত্রীর

১. বাযযার থেকে দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাবারানিও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। বাযযার থেকে বর্ণিত দুইটি সনদের মধ্যে একটিতে সহীহ মাজমা' আয-যাওয়া'ইদের (৪/৩০৯) রাবীগণ রয়েছেন। হাকিম তার মুসতাদরাকে (১/১৯০) এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। আয-যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।
২. আহমাদ (২/৩৪৭, ৪৭১), আবু দাউদ (২১৩৩), তিরমিজি (১১৪১), আন নাসাঈ (৭/৬৩), ইবনে মাজাহ (১৯৬৯), হাকিম (২/১৮৬), ইবনে হিব্বান (৪১৯৪) এবং দারিমি (২২০৬)।
৩. আহমাদ (৬/১৪৪), আবু দাউদ (২১৩৪), তিরমিজি (১১৪০), আন নাসাঈ (৭/৬৪), ইবনে মাজাহ (১৯৭১), হাকিম (২/১৮৭), ইবনে হিব্বান (৪১৯২) এবং দারিমি (২২০৭) । আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত।

সন্তানের প্রতি উদাসীন, সে জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী।

হালাল খেলাধুলা ও বিনোদন

বিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সব সময় কিছু সময় নিজেদের জন্য আলাদা করে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন থেকে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এক সফরে আয়িশা রা. নবীজি ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। একসময় আমার স্বাস্থ্য বেড়ে গেল। পরে আবার তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে বিজয়ী হলেন। তিনি বললেন, "এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।"'[১]

রসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মজা করতেন এ রকম আরেকটি উদাহরণ আয়িশা রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার ওপর খুশি থাকো, আর কখন রেগে থাকো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী করে বোঝেন?"

তিনি বললেন, "তুমি খুশি থাকলে বলো, 'না! মুহাম্মাদের রবের কসম!' আর আমার ওপর নারাজ থাকলে বলো, 'না! ইব্রাহীমের রবের কসম!'"

শুনে আমি বললাম, "ঠিক বলেছেন। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নামটা উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকি।"[২]

প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার স্বামী-স্ত্রী-সন্তান একসাথে হয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া বা বাসায় শিক্ষণীয় খেলার আয়োজন করা উচিত। এ ধরনের হালাল বিনোদন পরিবারের সদস্যদের মাঝে হৃদ্যতা বাড়ায়।

দুঃখজনকভাবে আজ বহু পুরুষ পরিবার ছেড়ে অন্যত্র আনন্দ খোঁজে—ডিশ টিভি দেখে, বন্ধুদের সাথে তাস খেলে সময় কাটায়। স্ত্রী-সন্তানদের কথা ভুলে সময়গুলো অপচয় করে। এতে করে পরিবারের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে, স্ত্রীর সাথে ঝগড়াবিবাদ বাড়তে থাকে। পরিবারে ভালোবাসার অভাব হাহাকার তোলে।

---

১. আহমাদ (২৩৫৯৮), আবু দাউদ (২৫৭৮), ইবনে মাজাহ (১৯৭৯)। আলবানি সহীহ বলেছেন।
২. বুখারী (৫২২৮), মুসলিম (২৪৩৯) এবং আহমাদ (২৩৪৯২)

ডিশ টিভিকে অনেক পুরুষ এখন যেন দ্বিতীয় স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছে। প্রকৃত স্ত্রীর প্রতি তাদের কোনো মনোযোগ, হৃদয়ের টান কাজ করে না; শুধু শরীরটাই যেন তাদের সাথে থাকে। তার আচরণে মনে হবে যেন স্ত্রী-সন্তান নিছক ঘরসজ্জার আসবাব! এমন স্ত্রী-সন্তান তার জন্য কীভাবে চক্ষুশীতলকারী হয়ে উঠবে বলুন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক অশান্তির কিছু কারণ

গাইরতে বাদড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি

ব্যবহারিক দিক দিয়ে গাইরত শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে—আত্মমর্যাদাবোধ, আগ্রহ, উদ্দীপনা, উদ্বেগ, ঈর্ষা ইত্যাদি। কারও ক্ষেত্রে গাইরত হতে পারে মর্যাদাবোধের—যখন তার ভালোবাসার মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয় বা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, তখন ভালোবাসার মানুষকে গাইরতের বশবর্তী হয়ে সে রক্ষা করতে চায়। এই ঈমানী গাইরতে বলীয়ান হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল উদ্যমে জিহাদ করেছেন। গাইরত মানুষের দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গাইরত নষ্ট হয়ে গেলে তার দ্বীনও নষ্ট হয়ে যায়।

গাইরতের আরেকটি অর্থ—যা 'আত্মমর্যাদাবোধ' এর বেশ কাছাকাছি—তা হচ্ছে 'ঈর্ষা'। কারও প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে সে অন্য কারও হোক এমনটা মানুষ কখনোই চায় না। সে ভাবতেই পারে না, সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে ভালোবাসতে পারে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এই গাইরত প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হতে পারে।

প্রশংসনীয় হবে যখন কেউ তার স্ত্রীকে কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে দেখে এবং আত্মসম্মানবোধের কারণে সে রেগে যায়। আর নিন্দনীয় হবে যখন কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে সন্দেহ করে, যদিও সে সন্দেহ জাগানোর মতো কিছুই করেনি। দ্বিতীয় ধরনের গাইরত ভালোবাসাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"এক ধরনের গাইরতকে আল্লাহ পছন্দ করেন, আরেক ধরনের গাইরতকে তিনি ঘৃণা করেন।"

সাহাবীরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ কোন গাইরত পছন্দ করেন?"

তিনি ﷺ বললেন, "আল্লাহর অবাধ্যতা বা সীমালঙ্ঘন দেখে কারও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠা।"

সাহাবীরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ ﷻ কোন গাইরত অপছন্দ করেন?"

তিনি ﷺ বললেন, "উপযুক্ত কারণ ছাড়া সন্দেহবশত তোমাদের কারও গাইরত।"[১]

অপর এক হাদিসে সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. বলেন, "যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো পরপুরুষকে আমি দেখি তবে তাকে ধারালো তরবারি দিয়ে কেটে ফেলব।"

তার এ কথা রসূলুল্লাহর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মমর্যাদার অধিকারী।"[২]

আল্লাহর আত্মমর্যাদার প্রকাশ হলো, তিনি নিষেধ করেছেন এমন কাজ কেউ করলে তাকে শাস্তি দেন।[৩]

আরেক ধরনের গাইরত আছে যা কেবল সেসব নারী অনুভব করে যাদের স্বামীর একাধিক স্ত্রী রয়েছে। এ ধরনের ঈর্ষা প্রতিটি নারীর স্বভাবজাত। এ ধরনের গাইরত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্যশীল হওয়া, প্রয়োজনে তাকে নরম স্বরে উপদেশ দেওয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীরাও এ ধরনের গাইরত থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

আনাস রা. বলেন, "একবার রসূল ﷺ আয়িশার ঘরে ছিলেন। সে সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কেউ একটি পাত্রে কিছু খাবার পাঠালেন। আয়িশা খাদিমের হাতে ঝাঁকি দিলেন। ফলে পাত্রটি পড়ে ভেঙে গেল।

নবীজি ﷺ পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একসাথে করলেন, তারপর খাবার কুড়িয়ে তাতে রেখে বললেন, "তোমাদের মায়ের গাইরতে আঘাত লেগেছে।" তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং আয়িশার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙেছিল তার কাছে পাঠালেন। ভাঙা পাত্রটি আয়িশার ঘরেই রেখে দিলেন।"[৪]

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের এরূপ ঈর্ষার আরও ঘটনা হাদিসে পাওয়া যায়।

---

১. আহমাদ (৫/৪৪৫, ৪৪৬), আবু দাউদ (২৬৫৯), দারিমি (২২২৬), ইবনে হিব্বান (৪৭৪২ - ইহসান) এবং হাকিম (১/১৪৮)। 'উকবাহ বিন 'আমির রা. থেকে বর্ণিত। হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহাবী একমত জানিয়েছেন। দেখুন : সহীহ আল জামি' (৫/২১৫)

২. বুখারী (৬৮৪৬, ৭৪১৬), মুসলিম (১৪৯৯), দারিমি (২২২৭) এবং আহমাদে (৪/২৪৮)। মুগীরাহ বিন শু'বাহ রা. থেকে বর্ণিত।

৩. ফাতহুল বারী (৯/২৩১)

৪. বুখারী (২৪৮১, ৫২২৫), আহমাদ (৩/১০৫, ২৬৩), আত তিরমিজি (১৩৫৯), আন নাসাঈ (৭/৭০), আবু দাউদ (৩৫৬৭), ইবনে মাজাহ (২৩৩৪) এবং দারিমি (২৫৯৮)

ঈর্ষা ও অহেতুক সন্দেহ পরিবারে অশান্তি তৈরি করে, তালাক পর্যন্ত ডেকে আনে

প্রথমত, পুরুষের একাধিক স্ত্রী না থাকলেও স্ত্রী ঈর্ষা ও মিথ্যা সন্দেহে আক্রান্ত হতে পারে। সম্মানিত দ্বীনী বোন, বিনয়ী হোন, আপনার হৃদয় থেকে ঈর্ষা ও সন্দেহের অনুভূতিগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন। রসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা রা.-কে বলেছিলেন,

"আয়িশা! শান্ত হও। আল্লাহ যখন পরিবারের সদস্যদের জন্য কল্যাণ চান, তাদের মাঝে নম্রতা দান করেন।"[১]

স্বামীর প্রতি আপনার গাইরত যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হলো—তাকে আপনি দোষারোপ করছেন। ফলে আপনাদের দুজনের অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠবে। এরই জের ধরে খুঁটিনাটি বিষয়ে ঝগড়া লেগেই থাকবে।

কোনো নারীই গাইরত থেকে মুক্ত নয়—এমনটাই স্বাভাবিক। তবে একে শরীয়তের বেঁধে দেওয়া সীমারেখার মাঝে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনি হয়তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের উদাহরণ দিতে চাইবেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, তাঁরা কারা ছিলেন আর তাঁদের স্বামী কে ছিলেন!

হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন, তাঁর স্ত্রীরাও মানুষ ছিলেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, এই সামান্য ঈর্ষা তাঁদের জীবনে ব্যতিক্রম ছিল। তাই একে আদর্শ হিসেবে ধরা যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে—যখন রসূলুল্লাহ ﷺ মারা যান তখন আয়িশা রা.-এর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। ওপরে বর্ণিত ঘটনার সময় আয়িশা রা. খুবই কমবয়সী ছিলেন, যে কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শেখানোর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করেছেন। পরে আয়িশা রা. বড় হয়ে তাঁর নিজের ও অন্যান্য স্ত্রীদের ঈর্ষা এবং সে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

সম্মানিত বোন, আপনার স্বামী রসূলুল্লাহ ﷺ নন এবং তিনি কোনো দিক দিয়েই তাঁর আদব-কায়দার সমতুল্য হতে পারবেন না। আয়িশা রা. ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয়। তিনি আয়িশা রা.-এর প্রতি যত ধৈর্য দেখিয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই আপনার স্বামীর মাঝে ততটা ধৈর্য পাবেন না।

১. আহমাদ (৬/৭১, ১০৪, ১০৫), মাজমা' আয যাওয়া'ইদ (৮/১৯)। এর সকল রাবীগণ আস-সহীহর রাবী।

চেষ্টা করুন, যাতে আপনার স্বামীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে এমন কোনো কার্যকলাপ না হয়। তার সামনে কখনোই অন্য পুরুষের প্রশংসা করবেন না, অন্য পুরুষের সৌন্দর্যের ব্যাপারে বলবেন না, কখনোই অন্য পুরুষের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করবেন না।

অনেক নারীর স্বামী মারা যাবার পর বা তালাকের পর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। বর্তমান স্বামীর সামনে পূর্ববর্তী স্বামীর প্রশংসা করা কখনোই উচিত নয়। পুরুষেরা এ ধরনের কথা খুবই অপছন্দ করে। এ ধরনের কথা তাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে। তার সাথে সে নিজেকে তুলনা করতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই তার মনে কাজ করে, 'সে আমার পৌরষত্বে আঘাত করেছে।'

বর্তমান স্বামী আপনার পূর্ববর্তী স্বামীর ব্যাপারে জানার জন্য জোরাজুরি করলে যতটুকু দরকার শুধু ততটুকুই বলুন, তার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকুন। জেনে রাখুন, পুরুষের প্রকৃতিই হলো সে তার স্ত্রীর একমাত্র পুরুষ হতে চায়। আপনার স্বামী আপনার মনে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে স্নেহশীল, সবচেয়ে জ্ঞানী ও সবচেয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে স্থান পেতে চায়। পুরুষদের এই স্বভাবজাত ইচ্ছা জান্নাতে সম্পূর্ণরূপে পূরণ হবে, যখন তার স্ত্রী হুরদের মাঝে থেকে বলে উঠবে, "আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতে আপনার চেয়ে উত্তম কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আর এমন কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না, যে আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয়।"[১]

প্রিয় দ্বীনী বোন, ঈর্ষা করার চেয়ে বরং এমনসব কাজ করুন যার দরুন আপনার স্বামী আপনাকে আরও বেশি ভালোবাসবে। তার সামনে নিজেকে উত্তমরূপে তুলে ধরুন। আপনার নারীত্বকে তার সামনে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুললে তিনি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। আপনাকে ছাড়া অন্য কারও কথা তিনি ভাবতেই পারবেন না।

তার সেবা করুন, তার সাথে নম্রস্বরে ভালোবাসার কথা বলুন, তার জন্য সুন্দর করে সাজুন। তাকে অনুভব করান—তিনিই আপনার পুরুষ। বাইরের কোনো মহিলা আপনার স্বামীকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলতে যা যা করতে পারে, তার সবই করুন। পার্থক্য হলো—আপনি যা করছেন তা হালাল তো বটেই, বরং প্রশংসনীয়।

স্বামীর সাথে এতটাই ভালো আচরণ করুন যেন তিনি আপনার ভালোবাসা ও যত্নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, আপনাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীর যেন তার

১. দেখুন : তাফসীর ইবনে কাসির, সূরা আর-রহমান, আয়াত ৫৬।

প্রয়োজন না পড়ে। স্ত্রী নিজ সৌন্দর্যের ব্যাপারে যত্নশীল না হলে, স্বামীর সাথে সম্মানের সাথে মিষ্টি-মিষ্টি কথা না বললে, নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে, নিজের ওজনকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে, স্বামী তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

অনেক নারীই স্বামীর অন্য নারীর দিকে তাকানোর ব্যাপারে অভিযোগ করেন। দেখা যাবে, ওপরে আমরা যেসব চেষ্টার কথা বলেছি এসব তারা একদমই করেন না। এর দ্বারা তার স্বামীর পাপের পক্ষে আমরা সাফাই গাইছি না। আমাদের প্রশ্ন হলো, স্বামীর এই অবস্থা ঠেকানোর জন্য তার করণীয়গুলো কি তিনি পালন করেছেন? না করলে তিনিও ভুল করছেন।

কেন ভুলে যাচ্ছেন, পৃথিবীর এত নারীর মাঝে আপনার স্বামী কেবল আপনাকে পছন্দ করেছেন। আপনাকে তার জীবনসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব জানিয়েছেন! বোন, বাস্তবতায় ফিরে আসুন! আপনার শত্রু শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ফিরে আসুন। বরং তাঁর কথাগুলো শুনুন যিনি আপনার প্রতি দয়াশীল, "মহান আল্লাহ্ ওই নারীর দিকে তাকান না, যে তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ; অথচ তাকে ছাড়া তার চলা সম্ভব নয়।"

ঈর্ষার বিষয়টিতে ফিরে আসি। কিছু নারী বলে, "স্ত্রী যে স্বামীর ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত, এটা স্বামীকে না বোঝানো বোকামি। বরং ঈর্ষার দ্বারা স্বামীকে বোঝানো যায়, সে সত্যিই স্বামীকে ভালোবাসে।" এটা কোন ধরনের গাইরত বা ঈর্ষা? যখন-তখন ঈর্ষাকে লাগামছাড়া করে দেওয়া নারীর জন্য বোকামি। এতে তাদের সংসার ধ্বংসের পথে পা বাড়ায় মাত্র। সঠিক-বেঠিক, সুস্থতা-অসুস্থতা, সত্য-মিথ্যার মাঝে কখনো কখনো সূক্ষ্ম ফারাক থাকে যা মানুষ বুঝতে পারে না। তেমনি নারী যে ঈর্ষার প্রকাশ ঘটাতে চাচ্ছে সেটা ভালোবাসার ঈর্ষা নাকি সন্দেহের—সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য স্বামী না-ও বুঝতে পারে!

আর নারী যখন ঈর্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়, তখন স্বামীকে সন্দেহ করা শুরু করে। স্বামীর প্রতিটি কাজে পিছু লেগে থাকে। পদে-পদে স্বামীকে তার কাজ, বন্ধুবান্ধব ও বাইরে থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন করে। এভাবে সে তার নিজের অন্তরের প্রশান্তি তো নষ্ট করেই, একই সাথে এককালে তাদের মাঝে যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল সেটিকেও নষ্ট করে দেয়।

অবশ্য নারীর ঈর্ষান্বিত হওয়ার সত্যিকার কারণও থাকতে পারে। তার কাছে প্রমাণ থাকতে পারে যে, তার স্বামী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে; অথবা অন্য স্ত্রীর সাথে তার চেয়ে উত্তম আচরণ করছে। এসব ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা তার জন্য বৈধ ও ন্যায়সংগত।

আমাদের সমালোচনা মূলত বিনা কারণে ঈর্ষা করার ব্যাপারে, যার পেছনে কোনো প্রমাণ থাকে না। ধরুন, কারও দুজন স্ত্রী রয়েছে এবং তিনি তাদের উভয়ের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ করেন। তাদের জন্য সমান খরচ করেন। এ অবস্থায় প্রত্যেক স্ত্রীর অল্প হলেও ঈর্ষা অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু সেটাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। ঈর্ষাবশত ভুল করে কিছু বলে বসার ব্যাপারে স্ত্রীদের সাবধান থাকতে হবে।

পুরুষের গাইরত

স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পুরুষের গাইরত ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কোনোটিই ঠিক নয়। স্ত্রীকে আগলে রাখতে তার প্রতি ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করবে এমনটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে খুব বড় সমস্যায় রূপ নিতে পারে এমন ছোট ছোট ভুল থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হবে। ইসলামী শরীয়তের আলোকে স্ত্রীর জীবনযাপন নিশ্চিত করা অভিভাবক হিসেবে তার দায়িত্ব। তার নিজেকে তো বটেই, পরিবারকেও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

তবে অতিরিক্ত গাইরতের বশে বিনা কারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করা একদমই অনুচিত। অনেকের কাছে স্ত্রীর বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, স্ত্রীর আসল রূপ বের করতে তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি পর্যন্ত করে! অথচ সন্দেহের উপযুক্ত কারণ ছাড়া কারও পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান পাপ। তোমরা গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান কোরো না।"[১]

রসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে এ ব্যাপারে কড়া নিষেধ করে বলেন, "আল্লাহ এমন গাইরত ঘৃণা করেন যা মানুষ (সন্দেহের বশে) তার পরিবারের (স্ত্রীর) ওপর করে, যদিও সে সন্দেহমূলক কিছুই করেনি।"

আরেকটি প্রান্তিকতা হলো, স্ত্রীর পাপ কাজের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাইরত কাজ না করা। এমনটা যে করে সে শুধু দুনিয়াতে নয়, আখিরাতেও শোচনীয় জীবন কাটাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ ﷻ কিয়ামতের দিন দাইয়ুসের দিকে ফিরেও তাকাবেন না—জান্নাতে তাকে ঢুকতে দেবেন না।"[২]

দাইয়ুস নিজের স্ত্রী ও পরিবারের লম্পট ও অশোভনীয় আচরণের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে। তাদের ব্যাপারে কোনো আত্মমর্যাদাবোধ বা আগলে রাখার অনুভূতি তার মাঝে কাজ করে না।

মানুষের নফস হলো শিশুর মতো। একে যেভাবে শেখানো হবে, সেভাবেই গড়ে উঠবে। স্ত্রীকে নিজ ইচ্ছামাফিক চলতে দিলে তার চাহিদার বাঁধ ভেঙে যাবে, স্বামীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে চলে যাবে। স্ত্রীর অসংযত চাহিদা পূরণের জন্য যে পুরুষ দিনরাত এক করে পরিশ্রম করে, সে নিজ হাতে নিজের দুর্দশা ডেকে আনে। তাই তার চাহিদা পূরণে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তার চাহিদাগুলো যেমন অবহেলা করা যাবে না, তেমনি তার সব ইচ্ছাও মেনে নেওয়া যাবে না।

আসলে গাইরত ততক্ষণই উত্তম গুণ যতক্ষণ তা সীমার মাঝে থাকে; কোনো বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি করা না হয়। প্রশংসনীয় গাইরতের অধিকারী মানুষ বিনা কারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করেন না, উপযুক্ত কারণ ছাড়া তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেন না। একই সাথে স্ত্রীর আচরণের ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকেন না; বরং স্ত্রী যেন পাপ থেকে দূরে থাকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকেন।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২

২. আহমাদ (২/৬৯, ১২৮, ১৩৪), নাসাঈ (৫/৮০)। ইবনে 'উমার রা. থেকে বর্ণিত।

গাইরতে বাড়াবাড়ি পরিবারে অনেক অশান্তির স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে। কিছু পুরুষ স্ত্রীর ওপর এতই সন্দেহপ্রবণ থাকে যে, তাদের প্রতিটি গতিবিধি নজরে রাখে। স্ত্রীর ওপর অধিকার ফলাতে গিয়ে অন্য মেয়েদের সাথে তাকে দেখা পর্যন্ত করতে দেয় না। কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে সারাদিন কী করেছে, কার সাথে দেখা করেছে—এসব প্রশ্ন বারবার করতে থাকে। এমনকি স্ত্রী তার বাবা-মা, ভাই-বোনের সাথে সময় কাটালেও তারা ঈর্ষা অনুভব করে।

এ রকম জোরাজুরি-বাড়াবাড়ি স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বরঞ্চ স্ত্রী দ্বীনদার হলে, ঘরের বাইরে পুরুষ এড়িয়ে চললে তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই।

স্ত্রীর কোনো মন্দ কাজের কথা কানে এলে সাথে সাথে তার ওপর চড়াও হবেন না; বরং প্রথমেই এরূপ সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"হে ঈমানদাররা, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।"[১]

অন্যদিকে স্ত্রীকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে রাখাও অনুচিত। স্ত্রীর কাজের ব্যাপারে ভাবলেশহীন-উদার থাকা পরিবারের দুর্যোগ ডেকে আনে। পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকালে যে কেউ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে। সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী ক্লাবে যায়, তারপর তার সব বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্ত্রী রাতভর তাদের সাথে নেচে-গেয়ে সময় কাটায়। এভাবে এক সময় সে অন্য কাউকে পছন্দ করে ফেলে, অথবা অন্যদের মাঝে নিজ স্ত্রীকে দেখে তার স্বামীর মনে ঈর্ষা জেগে ওঠে। এরপর তাদের ওপর অশান্তি জেঁকে বসে।

অবশ্য এখন আর পশ্চিমাদের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের সমাজেই দেখা যাচ্ছে, পুরুষেরা বন্ধুদের সাথে স্ত্রীকে অবলীলায় গল্পগুজব করতে দিচ্ছে।

---

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ৬

কোনো বন্ধু হয়তো তাদের যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে ফেলে, ফলে বাসায় পুরুষ কেউ না থাকলেও অবলীলায় তার আনাগোনা চলতে থাকে। পরে স্বামী যখন জানতে পারে, স্ত্রী তার বন্ধুর সাথে একাকী ছিল, তখন সে রেগে যায়। কোথায় ছিল তার গাইরত-সম্মানবোধ, যখন সে বন্ধুকে তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল? কে তাদের অবলীলায় কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিল?

অনেক মেয়ে বাসায় বন্ধু ডেকে এনে পড়াশোনা করে। বাবা-মা এসব দেখেও কিছু মনে করে না। কিন্তু যখন তাদের দুজনকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় তারা আবিষ্কার করে, তখন তাদের মনে ঈমান জেগে ওঠে, প্রচণ্ড রেগে যায়। মেয়েকে তার ছেলে বন্ধুদের সাথে মিশতে দেয়ার সময় তাদের এ গাইরত কোথায় ছিল? মুসলিম পরিবারগুলোতে এই দ্বিমুখী আচরণ আজ অহরহ দেখা যায়। বিপদের রাস্তা খুলে দিয়ে পরে তারা হায় হায় করে। অথচ চাইলেই শুরুতে বিপদটা তারা রুখে দিতে পারত।

অনেক বাবা এসে ইমামের কাছে নালিশ করে, তাদের মেয়ে অমুসলিম ছেলের সাথে প্রেম করছে, তাকে বিয়ে করতে চায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে এ ঘটনাগুলো অহরহ ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে ইমামের কীই-বা করার থাকে! বরং তিনি বলে বসেন, "এখন আসলেন আমার কাছে! অথচ যখন আপনার মেয়ে ছোট ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার বয়স ছিল তখন কেন আসেননি? সে সময় যে শিক্ষা দিয়েছেন সেটার উল্টোটা এখন কীভাবে তার কাছে আশা করেন!"

এজন্য শুরুতেই মন্দের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলেই কেবল পরিবারগুলোকে বাঁচানো যাবে। আমরা শুধু নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকব না; বরং আমাদের স্ত্রী-সন্তানের কাজের জন্যও দায়ী থাকব। শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে চললে খুব সহজেই আমরা গাইরতে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে পারব। শরীয়তের নির্দেশ হলো, সবাই মার্জিত পোশাক পরবে, অপরিচিত মানুষের সাথে মিশবে না, বেশি বেশি দ্বীনদার মানুষের সাথেই মেলামেশা করবে এবং ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে এমন মানুষ থেকে দূরে থাকবে।

তরবারির চেয়েও ধারালো অস্ত্র

সম্ভবত জিহ্বাই একমাত্র অঙ্গ যা জীবনে এত সমস্যার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে। স্বামী-স্ত্রীকে শিখতে হবে কখন কথা বলতে হয় আর কখন চুপ থাকতে হয়, কথা বলার সময় কীভাবে কথা বলতে হয়।

আবু হামিদ আল গাজালি রহ. বলেন, "জিহ্বা আল্লাহর দেওয়া বড় নিয়ামতগুলোর একটি, তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোর একটি। আকারে ছোট হলেও এর বাধ্যতা ও অবাধ্যতার পরিণাম অনেক বড়। ঈমান আর কুফরের প্রকাশ ঘটে এর মাধ্যমেই...। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"অসংযত কথাবার্তার কারণে মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।"[১]

জিহ্বার অনিষ্টতা থেকে কেবল তিনিই রেহাই পেয়েছেন, যিনি শরীয়তের লাগাম পরিয়ে একে সংযত রেখেছেন; দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী বিষয় ছাড়া অন্য কোথাও এই লাগামে ঢিল দেন না...। জিহ্বা হচ্ছে মানুষের দেহের সবচেয়ে অবাধ্য (এবং বিপজ্জনক) অঙ্গ। কারণ, কোনো চেষ্টা-ক্লান্তি-কষ্ট ছাড়াই এটি নড়তে পারে। লোকেরা এর বিপদকে হালকাভাবে নেয়, অথচ ভুলে যায়, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র এটি।"

উকবা ইবনে আমির রা. একবার নবীজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, মুক্তির উপায় কী?" তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় (অর্থাৎ বাড়িতে বেশি থাকো) এবং তোমার গুনাহর জন্য কাঁদো।"[২]

আরেক হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা বলব? তারা হলো সারসারুন (বাচাল—যারা কথার দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করে) এবং মুতাশাদ্দিকুন (বাগ্মিতা দেখানোর জন্য

---

১. আহমাদ (৫/২৩১, ২৩৬, ২৩৭), তিরমিজি (২৬১৬), ইবনে মাজাহ (৩৯৭৩) এবং হাকিমে (২/৪১৩) হাদিসটি সহীহ হিসেবে বলা হয়েছে। ইবনে আবিদ-দুনিয়া তার আস-সামত গ্রন্থে (৬) হাদিসটি এনেছেন।
২. আহমাদ (৪/১৪৮, ১৫৮, ১৫৯); তিরমিজি (২৪০৬) একে হাসান বলেছেন। ইবনে আবিদ-দুনিয়া তার আস-সামত গ্রন্থে (২) হাদিসটি এনেছেন।

সুন্দর করে যারা কথা বলে)।"[১]

অন্য এক হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"মানুষ সকালে ঘুম হতে ওঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। যদি তুমি সঠিক পথে থাকো, তাহলে আমরাও সঠিক পথে থাকতে পারব। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও, তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হব।'"[২]

'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রা. বলেন, "কসম আল্লাহর যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সবকিছুর চেয়ে জিহ্বাকে বন্দী রাখা বেশি প্রয়োজনীয়।"[৩]

হাসান রহ. বলেন , "যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে না, সে তার দ্বীনকে বুঝতে পারেনি।"

দাঊদ আ.-এর প্রজ্ঞার ব্যাপারে বলতে গিয়ে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, "একজন জ্ঞানী মানুষের দায়িত্ব হলো তিনি যে যুগে বাস করছেন সে (সময়ের ঘটনাবলি) সম্পর্কে জানা, জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং (অন্যের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে) নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা।"

ইহইয়া গ্রন্থে আবু হামিদ আল-গাজালি রহ. জিহ্বার এমন কিছু কাজের কথা তুলে ধরেছেন যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ বিপথে পা বাড়ায়। এখানে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

- এমন বিষয়ে কথা বলা, যা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়
- অপ্রয়োজনীয়-অতিরিক্ত কথা বলা
- মিথ্যা কথা বলা
- বিনা কারণে তর্ক করা

---

১. আহমাদ (২/২৬৯)। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

২. সহীহ আল-জামি' (৩৫১)। এ ছাড়াও এই হাদিসটি মুসনাদ (৩/৯৬) এবং তিরমিজিতে (২৪০৭) আবু সা'ঈদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩. তাবারানি অনেকগুলো সনদে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোর সকল রাবীই বিশ্বস্ত। [মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ (১০/৩০৩)]

- মেকি স্বরে সুন্দর করে কথা বলা

- অভিশাপ দেওয়া বা অশালীন কথা বলা।

- গান গাওয়া ও অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করা।

- অপরকে হেয় করা

- কাউকে বিশ্বাস করে বলা হয়েছিল এমন গোপনীয় কথা প্রকাশ করে দেওয়া

- মিথ্যা অঙ্গীকার-শপথ করা

- মিথ্যা কথা বলা

- গীবত করা

- পরনিন্দা করা

- সম্মুখ প্রশংসা করা (কারও কাছে সুবিধা লাভের আশায়)

যে মজলিস আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আলোকিত হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মিথ্যা ও পাপের মাধ্যমে কলঙ্কিত হয়। এ ধরনের মজলিসগুলোতে সাধারণত নিম্নোক্ত মন্দ বিষয়গুলো থাকে :

১) মজলিসে উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের দোষ নিয়ে আলোচনা করে।

২) অন্যকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কেউ তাদের খারাপ কথা বলতে নিষেধ করে না; বরং তাদের উৎসাহ দেয়, বাজে কথায় তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে।

৩) এ ধরনের সমাবেশে সর্বোচ্চ মাত্রায় অহংকার ছড়িয়ে থাকে। এ কারণে উপস্থিত ব্যক্তিরা নিজেদের প্রশংসা করে এবং অনুপস্থিতদের উপহাস করে।

৪) অন্যের নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হলে সেটার পেছনে কারণ হিসেবে থাকে হিংসা। তারা আশা করে যেন সেই নিয়ামতগুলো থেকে সে বঞ্চিত হয়।

৫) এমনকি এ ধরনের মজলিস কখনো গীবত ও অন্যান্য পাপ থেকে মুক্ত থাকলেও দেখা যায়, মানুষ অনর্থক খেলাধুলা ও রসিকতার আসর হিসেবে একে বেছে নেয়।

অন্যকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না।

প্রিয় দ্বীনী ভাই, জিহ্বার অসংখ্য খারাপ দিক রয়েছে। এই একটি জিনিস আপনাদের দাম্পত্য জীবনকে বিষিয়ে তুলতে যথেষ্ট। মানুষের জিহ্বা তলোয়ারের মতো। স্ত্রীর সাথে কথাবার্তায় একে বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করুন। জিহ্বার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার এর মিষ্টতাকে নষ্ট করে, গাম্ভীর্যকে নিষ্প্রভ করে দেয়।

যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার অপছন্দনীয় কিছু বলতেই হয়, তবে প্রথমে নিশ্চিত করুন আপনি সঠিক পথে আছেন এবং তিনি আসলেই ভুল কিছু করছেন। নতুবা ঘনঘন বিনা কারণে তার সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি করলে তার কাছে আপনার কথার গুরুত্ব কমে যাবে। বরং তার সাথে কথাবার্তায় বিচক্ষণ হোন, তাকে বন্ধুর মতো উৎসাহ দিন। একজন বাবা যেভাবে পরম মমতায় সন্তানের ভুল ধরিয়ে দেয়, সেভাবে তাকে সংশোধন করুন। একজন শিক্ষক যেমন তার ছাত্রকে প্রজ্ঞার সাথে শেখায়, সেভাবে তাকে শেখান। এভাবে আপনি তার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন।

প্রিয় দ্বীনী বোন, স্বামীর সাথে কথা বলার সময় শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলুন—প্রতিটি স্বামীই এমন আচরণ চায়। কেউই স্ত্রীর চিৎকার শুনতে চায় না। কেউই স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে চায় না, কারণে-অকারণে তার চেঁচামেচি শুনতে চায় না। আপনার স্বামী ও বান্ধবীদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বলুন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾﴾

"যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে।"[১]

ফোনে কথা বলতে গিয়ে 'হ্যালো' এর বদলে "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" দিয়ে কথা শুরু করুন। ফোনে সরাসরি প্রয়োজন সম্পর্কে কথা বলুন, বিনা কারণে আলোচনা দীর্ঘ করবেন না। এমনকি আপনার স্বামী বাসায় না থাকলেও আপনার এমন অনেক কিছু করার আছে যা ফোনে কথা বলার চেয়ে উত্তম। যেমন : কুরআন তিলাওয়াত করা, সন্তানকে পড়ানো, বাসার কাজগুলো সেরে ফেলা ইত্যাদি।

১. আল-কুরআন, ৫০ : ১৮

সতর্কতার সাথে জিহ্বাকে সংযত রাখলে স্বামীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারবেন। একই সাথে আপনার সঠিক ফয়সালা এবং মুখনিঃসৃত মধুর ও বিচক্ষণ কথাকে আরও মূল্যায়ন করতে তিনি আগ্রহী হবেন।

অসার বিনোদন

আল্লাহ তাআলা অল্পসংখ্যক মানুষকেই টেলিভিশনের ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন। তারা ব্যতীত বেশির ভাগ মানুষই ঘরে স্যাটেলাইট ডিশ কানেকশন রাখতে চায়। স্যাটেলাইট ডিশ মুসলিম পরিবারের জন্য কতটা ক্ষতিকর কল্পনা করা অসম্ভব। ঘরের ভেতর পাপ ঢোকার সদর দরজা এই চারকোনা স্ক্রিন।

শুরুটা হয় পরিবারের কর্তার হাত ধরে। তিনি টিভিতে অশালীন অনুষ্ঠান দেখে নিজে তো পাপ করেই, সাথে স্ত্রী-সন্তানদের দেখতে দিয়ে তাদের পাপের বোঝাও নিজের ওপর টেনে নেন। যেখানে কিনা তার দায়িত্ব হলো পরিবারপ্রধান হিসেবে পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করা। পরিবারের শারীরিক চাহিদা পূরণ করাই তার একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করাও তার গুরুদায়িত্ব। সেখানে পরিবারের জন্য মন্দ বিষয়গুলো সহজলভ্য করে দেওয়া কতটা গুরুতর ভেবে দেখুন!

পরিবারে টিভির ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বাবার আগ্রহই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় সোফায় হেলান দিয়ে চ্যানেল বদলাতে। ঘরে স্ত্রী থাকলেও তার মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও। যেন সে কখনোই শোনেনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা—“অবশ্যই, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে।”

প্রিয় দ্বীনী ভাই, আপনি যে দীর্ঘ সময় টিভির সামনে ব্যয় করেছেন, পরিবারের চাহিদা অবহেলা করেছেন, সেসবের জন্য আল্লাহর সামনে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহকে ভয় করুন। ছলনার মায়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসুন। নিজের প্রতি, স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দয়া করুন। পাপের এই বাক্সকে আপনার বাসা থেকে দূর করুন।

কেন বুঝছেন না ভাই আমার! আপনাকে দেখেই আপনার সন্তানরা পাপ করা শিখছে! ভুলে যাচ্ছেন কেন, রাখাল হিসেবে আপনার পালের ব্যাপারে আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে!

টিভির পর অন্যান্য অসার বিনোদনের মধ্যে তাস খেলা, ভিডিও গেমস ও নেট ব্রাউজিংয়ের কথা না বললেই নয়। অহরহই দেখা যায়, রাত জেগে স্ত্রী বসে আছে স্বামীর অপেক্ষায়, অথচ স্বামী সারা রাত বন্ধুদের সাথে তাস খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে। স্ত্রী-সন্তানকে সময় না দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিডিও গেমস খেলছে বা মোবাইলে নেট ব্রাউজ করছে। পরিবারের বদলে অবসর সময়গুলো কেটে যাচ্ছে বন্ধুদের সাথে গল্প-আড্ডায়। বাসায় ফেরার আগে স্ত্রীকে ফোন করে বলে দেয় খাবার প্রস্তুত রাখতে। বাসায় এসেই তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা ঘুম শেষে সকালে কাজে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় যেন নিছক দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের।

কিন্তু বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো তো তার দায়িত্ব নয়! বরং স্ত্রী-সন্তানের সাথে সময় কাটানো তার কর্তব্য। সুখে-শান্তিতে বাস করতে, ইসলামের শিক্ষা মেনে চলতে পরিবারে সাথে সময় কাটানোর বিকল্প নেই। একজন বাবা তার পরিবারের জন্য দৃষ্টান্ত, তাকে দেখে পরিবারের বাকিরা শেখে। পরিবারকে শেখানোর দায়িত্ব তারই।

হালাল পথে স্ত্রী-সন্তানের সাথে বিনোদনের বহু উপায় আছে। প্রয়োজন একটু ভেবে সেগুলো খুঁজে বের করার। বইয়ের প্রথম দিকে পরিবারের সাথে খেলাধুলা ও বিনোদনের গুরুত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন থেকে উদাহরণ দেখিয়েছি। পরিবারের সাথে গুণগত সময়ের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলুন। দেখবেন পরিবার হয়ে উঠবে আপনার জন্য চক্ষুশীতলকারী শান্তির আশ্রয়।

স্ত্রীর সাথে রুক্ষ আচরণ

দাম্পত্য জীবনে অনেক অশান্তির সূত্রপাত হয় স্ত্রীর সাথে স্বামীর রুক্ষ আচরণ থেকে। নেতৃত্ব খাটাতে, অহংকার দেখাতে কিংবা স্ত্রীর ওপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এমনটা তারা করে। এগুলোর কোনোটিই স্ত্রীর সাথে রুক্ষ আচরণের অজুহাত হতে পারে না।

মুসলিমকে যেকোনোপ্রকার রুক্ষ আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ ধরনের চরিত্র স্বভাবতই অন্যদের দূরে ঠেলে দেয়। সেখানে স্ত্রী ও পরিবারের সাথে রুক্ষ আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নবীজি ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে কুরআনে এসেছে,

... وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ...
﴿١٥٩﴾

"আর তুমি কঠোর-স্বভাব, কঠিন-হৃদয় হলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত।"[১]

পূর্বে নাজিলকৃত আসমানি কিতাবগুলোতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা হিসেবে এসেছে, "তিনি কঠোর, রূঢ় ও নির্দয় স্বভাবের নন।"[২]

হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাদের আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দার ব্যাপারে জানাব না? এ হচ্ছে সে-ই, যে কঠোর ও অহংকারী।"[৩]

তিনি ﷺ আরও বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কোনো ঘরের মানুষের জন্য কল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝে নম্রতা দিয়ে দেন।"[৪]

"যে ব্যক্তি নম্র আচরণ থেকে বঞ্চিত, সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত।"[৫]

"যার চরিত্র ভালো এবং নিজ পরিবারের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, সে-ই ঈমানের দিক হতে পরিপূর্ণ মু'মিন।"[৬]

বাবা তার পরিবারের প্রধান ও তত্ত্বাবধায়ক। একজন আদর্শ নেতার মতো তাকে পরিবার পরিচালনা করতে হবে কোমলতা ও দয়ার সাথে উত্তম পন্থায়। অন্যদিকে স্বামীর কঠোরতায় কষ্ট পেলে স্ত্রীর উচিত যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরা, প্রজ্ঞার সাথে নরম কথায় স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করা।

---

১. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯
২. বুখারী (২১২৫), দারিমি (৬) এবং আহমাদ (২/১৭৪, ৪৪৮)
৩. মুসনাদে আহমাদ (৫/৪০৭)
৪. মুসনাদে আহমাদ (৬/৭১)
৫. মুসলিম (২৫৯২), ইবনে মাজাহ (৩৬৮৭) এবং আহমাদ (৪/৩৬২, ৩৬৬)। 'আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা. থেকে বর্ণিত।
৬. তিরমিজি (২৬১২)

বিয়ের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি

এই প্রসঙ্গে কথা বলার আগে প্রথমে জানা দরকার বিয়ের উদ্দেশ্যগুলো কী কী? আবু হামিদ আল-গাজালি রহ. এই প্রশ্নের উত্তরে পাঁচটি উদ্দেশ্য বা উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম উদ্দেশ্য

বিয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বংশধারা জারি রাখা। এর মাধ্যমে কোনো দম্পতি চারভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারেন, সেগুলো হলো :

ক) তাদের সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা ও বংশধারা বজায় রাখা মূলত আল্লাহরই আদেশ পালন।

খ) একইভাবে এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালন করা হয়। তিনি বলেছেন,

"প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা, হাশরের মাঠে আমি অন্যান্য উম্মাতের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব।"[১]

গ) দ্বীনদার সন্তান রেখে গেলে মৃত্যুর পরও তারা তার জন্য দু'আ করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া—সাদাকাহ জারিয়াহ, এমন ইলম যার দ্বারা (মানুষ) উপকৃত হয়, পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।"[২]

ঘ) যদি কারও সন্তান তার আগেই মারা যায়, তবে ওই সন্তান তার জন্য আখিরাতে সুপারিশকারী হবে। এক সাহাবী তার ছেলের মৃত্যু নিয়ে প্রচণ্ড শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

---

১. আবু দাউদ (২০৫০)

২. মুসলিম (১৬৩১), আবু দাউদ (২৮৮০), তিরমিজি (১৩৭৬), নাসাঈ (৬/২৫১) এবং আহমাদ (২/৩১৬, ৩৫০, ৩৭২)

"তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়, তার মাধ্যমে তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা; নাকি কাল কিয়ামতে তুমি জান্নাতে যে দরজা দিয়েই ঢুকতে চাইবে তোমার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে সে তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে?"

তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, সে আমার আগে জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দেবে—এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।"

তিনি ﷺ বললেন, "তাহলে তোমার জন্য তা-ই হবে।"

আরেকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি শুধু তার জন্য, নাকি আমাদের সবার জন্যই?"

নবীজি ﷺ বললেন, "তোমাদের সবার জন্য।"[১]

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করা, ক্ষতিকর কামনা দমন করা, নজরকে নত রাখা ও গোপন অঙ্গের হেফাজত করা। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটিই এই হাদিসে পরোক্ষভাবে এসেছে,

"যাকে আল্লাহ দ্বীনদার নারী (স্ত্রী হিসেবে) দিয়েছেন, তার দ্বীনের অর্ধেকের ব্যাপারে তাকে তিনি সাহায্য করেছেন। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন তাঁকে ভয় করে।"[২]

তৃতীয় উদ্দেশ্য

বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি লাভ। স্বামী-স্ত্রী একসাথে সময় কাটিয়ে শান্তি পায়, একে-অপরের দিকে তাকিয়ে আনন্দ পায়, পাশে বসে গল্পগুজবে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে। এভাবে তারা মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকে, ইবাদাতে উদ্যম ফিরে পায়। মানুষ সহজেই বিরক্ত হয়ে যায়, ফলে পথ থেকে ছিটকে পড়ে। তাকে বিশ্রাম না দিয়ে কাজ চাপিয়ে দিলে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে কিছুটা সময়

১. আহমাদ (৩/৪৩৬), নাসাঈ (৪/১১৮) থেকে বর্ণিত। মাজমা' আয-যাওয়া'ইদে (৩/৯, ১০) বর্ণিত হওয়ায় এর রাবীগণ আস-সহীহরও রাবী।
২. হাকিম (২/১৬১); তিনি ও আয-যাহাবী উভয়েই একে সহীহ বলেছেন। দেখুন : আলবানির আস-সহীহাহ (৬২৫)।

উপভোগ করার সুযোগ দিলে পুনরায় উদ্যম ফিরে পায়।

আলী রা. বলেছেন, "হৃদয়কে ঘণ্টাখানেকের জন্য বিশ্রাম দাও (বা বিনোদন দাও), নতুবা (একটানা কাজ বা পরিশ্রমের) চাপে পড়ে সে অন্ধ হয়ে যাবে।"

এজন্যই প্রিয়নবী রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিসকে আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে—সুগন্ধি, নারী এবং আমার চোখের শীতলতা করা হয়েছে সলাতকে।"[১]

চতুর্থ উদ্দেশ্য

বিয়ের পর মানুষ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আরও সুযোগ পায়। যেমন : সংসার সামলানোর কাজ স্ত্রীর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া যায়। যদি জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি পুরুষকে সংসারও সামলাতে হতো, তবে তার অনেক সময় নষ্ট হতো। ইলম অর্জন ও আমলের কোনো সময়ই সে পেত না। এভাবে স্ত্রী তার স্বামীকে আরও ভালো মুসলিম হতে সাহায্য করে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"তোমাদের কেউ (বিয়ে করলে) যেন পুণ্যবান, ঈমানদার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়। সে তোমাকে তোমার আখিরাতের ব্যাপারে সাহায্য করবে।"[২]

পঞ্চম উদ্দেশ্য

বিয়ের মাধ্যমে মানুষকে জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, যেন মানুষ আখিরাতে আরও বেশি পুরস্কার লাভ করতে পারে। এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে জীবনসঙ্গীর অধিকারগুলো আদায় করতে হয়, তার ব্যাপারে ধৈর্যশীল হতে হয়, সরল পথে থাকার ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করতে হয়। এই পরীক্ষারই একটি অংশ হলো পরিবারের জন্য হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা। মানুষ সন্তানদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়। আর এ ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে হলে সন্তানদের সঠিকভাবে বড় করে তোলা প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

১. আহমাদ (৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫), নাসাঈ (৭/৬১), হাকিম (২/১৬০) এবং সহীহুল জামি' (৩১২৪)

২. আবু নু'আইম থেকে হিলইয়াতে (১/১৮২, ১৮৩) বর্ণিত। আলবানি তার সহীহ আল জামি'তে (৫৩৫৫) একে সহীহ বলেছেন।

"মুসলিম ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে সবই তার জন্য সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"[১]

মানুষ যখন দাম্পত্য জীবনের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তখনি সংসারে জটিলতার সূত্রপাত ঘটে। স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা, তাকে স্ত্রী হিসেবে না ভেবে কাজের মানুষ হিসেবে আচরণ করা, স্ত্রীকে বিপথে চলতে দেওয়া—এ রকম আরও বহুভাবে মানুষ বিয়ের এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে যায়।

এখন সমাজের সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে, বিয়ের উদ্দেশ্যগুলো থেকে মানুষ দূরে চলে গিয়েছে। সন্তান জন্ম দেয়া, শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা, একজন ভালো মুসলিম হওয়া—এসবের বদলে অন্য উদ্দেশ্যে মানুষ এখন বিয়ে করছে। কিছু পুরুষের কাছে বিয়ে যেন ব্যবসায়ী উদ্যোগ। ধনী বাবা বা প্রভাবশালী আত্মীয় আছে এমন মেয়ে বিয়ে করা অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, যেন সমাজের উচ্চ শিখরে যেতে সাহায্য পাওয়া যায়। মেয়েরাও কম যায় না। তারা সচ্চরিত্রের পরিবর্তে সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদাকে স্বামী নির্বাচনের মাপকাঠি করে নিয়েছে।

এই ধারা যত চলতে থাকবে, দাম্পত্যের সমস্যাগুলো ততই বাড়তে থাকবে। সমাজ আরও দূষিত হয়ে উঠবে। ছলনার ওপর ভর করে গড়ে ওঠা এসব বিয়ে বেশি দিন টিকে না; যদিও-বা টিকে যায়, সম্পর্কগুলো মোটেও সুখকর হয় না। আর্থিক সমস্যা থেকে তারা বেঁচে যায় বটে, কিন্তু নিত্যদিনের কলহ আর অবাধ্য সন্তান তাদের দাম্পত্যের পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়।

ভেবে দেখুন, একজন আদর্শ পুরুষ কি অর্থলাভের আশায় বিয়ে করতে পারে? বরং পরিবারের জন্য আয় করা তো তারই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে তিনি দুনিয়ায় যেমন শান্তিতে থাকবেন, আখিরাতেও তেমনি পুরস্কৃত হবেন।

সংক্ষেপে এটুকুই বলব, বিয়ের সঠিক উদ্দেশ্যগুলো মাথায় রেখে যেমন জীবনসঙ্গী পছন্দ করতে হবে, তেমনি দাম্পত্য জীবনে সেসব উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমাদের চলতে হবে।

---

১. বুখারী (৫৫), মুসলিম (১০০২), নাসাঈ (৫/৬৯) এবং দারিমিতে (২৬৬৪) আবু মাস'উদ আল-বাদরি রা. থেকে বর্ণিত।

লোভ ও কৃপণতা

কৃপণতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর মাঝে দুটি স্তর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন—'শুহ' এবং 'বুখল।' বুখল বলতে সাধারণ কৃপণতা বোঝায়। আর শুহ বলতে গুরুতর লোভ-মিশ্রিত কৃপণতাকে বোঝায়—এর বশে মানুষ দ্বীনের খাতিরে খরচ করতে অনীহা দেখায়।

স্বাভাবিক জীবনধারায় বিশেষত দাম্পত্য জীবনে বুখল ও শুহের কারণে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। আল্লাহ ﷻ বুখল-স্বভাবের নিন্দা করে বলেছেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।"[১]

বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'বুখল'[২] ও 'শুহ'[৩] থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, বিচারের দিনে অত্যাচার অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান হও। কেননা, এ কৃপণতাই তোমাদের আগের কওমদের ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদের খুন-খারাবি ও রক্তপাতে উৎসাহ জুগিয়েছে, হারাম বস্তুসমূহ হালাল করতে প্রলোভন দিয়েছে।"[৪]

১. আল-কুরআন, ৩ : ১৮০

২. বুখারী (৬৩৬৯), মুসলিম (২৭০৬), আবু দাউদ (১৫৪০), তিরমিজি (৩৪৮৪), নাসাঈ (৮/২৫৭) এবং আহমাদে (৩/১৩৩, ১১৭, ১২২, ১৫৯, ১৭৯, ২৩১, ২৩৫, ২৪০, ২৬৫)। আনাস রা. থেকে বর্ণিত।

৩. নাসাঈ (৮/২৬৭)। 'আমর বিন মাইমুন রা. থেকে বর্ণিত।

৪. মুসলিম (২৫৭৮) এবং আহমাদে (৩/৩৩৩)। জাবির রা. থেকে বর্ণিত।

"যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না।"[১]

"কৃপণ ব্যক্তি (বাখিল) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

"শুহ ও ঈমান একজন মুসলিমের অন্তরে একসাথে থাকতে পারে না।"[৩]

সম্পদের প্রতি যতই ভালোবাসা থাকুক না কেন, একজন সাধারণ মানুষ যিনি কৃপণতার রোগ থেকে মুক্ত, তিনি তার পরিবারের প্রয়োজনে অবশ্যই খরচ করেন। তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম করে উপার্জন করেন, পরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তাদের দুঃখেই তার দুঃখ, তাদের সুখেই তার সুখ।

অন্যদিকে, কৃপণতা তার পরিবারের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনে। তার যথেষ্ট সম্পদ থাকার পরও তার স্ত্রী-সন্তান ঘরের বাইরে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। এভাবে সে নিজেই নিজেকে সমাজের কাছে অপমানের পাত্র বানায়।

একেকজনের কার্পণ্যের পেছনে একেক রকম কারণ কাজ করে। স্ত্রীকে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে অনেকে কৃপণতা করে। আবার অনেকে কোনো নেশার পেছনে সব সম্পদ খরচ করে ফেলে স্ত্রীর সাথে কৃপণতা করে—এ ক্ষেত্রে নিজের কামনা পূরণে সে উদার, অথচ স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে কৃপণ। আর তৃতীয় ধরনের কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করতেই থাকে, টাকা-পয়সার প্রতি ভালোবাসা ছাড়া তার আর কোনো মায়া নেই—এই লোক সবচেয়ে নিকৃষ্ট কৃপণ। শেষোক্ত কৃপণতার চেয়ে পরিবারকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃপণতা বা অন্যত্র অর্থব্যয়ের কারণে কৃপণতার নিরাময় তুলনামূলক সহজ।

একবার আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে 'উতবাহ রা. রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামীর কৃপণতার অভিযোগ নিয়ে এলেন। তিনি রা. বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আবু সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করেন না। তবে আমি তাকে না জানিয়েই তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় খরচ নিই। এতে কি আমার কোনো পাপ হবে?"

---

১. তিরমিজি (১৯৬১)। তার মতে হাদিসটি গারীব।
২. আহমাদ (১/৪, ৭) এবং তিরমিজি (১৯৬৩)। আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত।
৩. আহমাদ (২/২৫৬, ৩৪০, ৩৪২, ৪৪১) এবং নাসাঈ (৬/১৩)। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি তার সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ করো যা তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট।"[১]

নিজেদের কাজে ভারসাম্য না রাখা

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর কাজের ধরন থেকে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। যেমন একজন ডাক্তার স্বামীর কথা ধরুন। তাকে অনেক লম্বা সময় ধরে কাজ করতে হয়, বাকি সময় পড়াশোনায় তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, যেকোনো সময় জরুরি তলবে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একসাথে এগিয়ে না এলে দুজনেই ভুক্তভোগী হতে বাধ্য। স্ত্রীকে ধৈর্যশীল ও বোধশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। স্বামীকে হতে হবে সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল। তাকে বাসায় স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ সময় কাটানোর চেষ্টা করতে হবে।

স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকলে স্ত্রী সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বাসার কাজগুলো সেরে ফেলার, যেন স্বামী ফিরে আসার পর সময়গুলো তারা একসাথে কাটাতে পারে। আর স্বামীর উচিত ঘরে ফিরে যতটুকুই অবসর সময় পায় তা তার স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কাটানো; টিভির পেছনে নয়।

এমন যদি হয়, স্বামী সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় স্ত্রীর সাথে কাটাতে পারে, তবে তাদের সে সময়টারই উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে। এ সময় স্ত্রী তার সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি, অলংকার ও পোশাক পরে স্বামীর সামনে আসবে। ঘরকে এমনভাবে গুছিয়ে রাখবে যেন স্বামী কাজের ক্লান্তিকর পরিবেশ থেকে ফিরে এসে বাড়িতে শান্তির আবহে হারিয়ে যায়।

নিজেদের এই চেষ্টাগুলো সংসারজীবনকে অনেক উপভোগ্য করে তোলে। না হলে দেখা যাবে, একদিকে স্বামী কষ্টকর ও ক্লান্তিকর চাকরি করে, অন্যদিকে দুজনেই পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে থাকে যা শেষমেশ তালাকে গিয়ে ঠেকে।

---

১. বুখারী (৫৩৬৪), মুসলিম (১৭১৪), আবু দাউদ (৩৫৩২), নাসাঈ (৮/২৪৬, ২৪৭), ইবনে মাজাহ (২২৯৩), দারিমি (২২৫৯) এবং আহমাদ (৬/৩৯, ৫০, ২০৬)। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত।

স্ত্রীর কাজে নাক গলানো

প্রতিটি নারীই চান নিজ বাসায় রানির মতো থাকতে। তিনি তার চাওয়া ও রুচি অনুযায়ী ঘর গুছিয়ে রাখতে চান। সাংসারিক বিষয়গুলো তিনি সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান—যেন যে কেউ বাসায় ঢুকে আসবাবের বিন্যাস, দেয়ালের কারুকাজ, ঘর সাজানো দেখে তার নারীত্বের ছোঁয়া ও রুচিবোধ অনুভব করতে পারে।

এ কারণে সাংসারিক বিষয়ে স্বামীর নাক গলানো নারীরা চূড়ান্ত রকমে অপছন্দ করেন। এ যেন তার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার শামিল। এর মাধ্যমে স্বামী অশান্তির দরজা খুলে দেয়—নষ্ট হয় পরিবারের ভারসাম্য ও সুখ-শান্তি।

প্রিয় দ্বীনী ভাই, আপনার কর্মস্থল, মসজিদ ও সমাজে ব্যস্ত থাকার মতো যথেষ্ট কাজ রয়েছে। সেগুলো করুন। সংসার সামলানোর বিষয়গুলো স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিন। কীভাবে তার রান্নাঘর সাজানো থাকবে, কীভাবে বাসার ঘরগুলো অলংকৃত হবে, কীভাবে সংসার চলবে—এসব তার মনমতো করার স্বাধীনতা দিন। একজন আরেকজনকে বিরক্ত না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজ্য দেখে রাখুন, পরিবারে সুখ নিজ থেকেই ধরা দেবে।

সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা

বন্ধ্যাত্ব ও কন্যাসন্তানের জন্ম অনেক সংসারে অশান্তি ডেকে আনে। অনেক স্বামী পুত্রসন্তান পেতে যতটা আগ্রহী, কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে ততটাই অনাগ্রহী। পরীক্ষা হিসেবে আল্লাহ ﷻ কাউকে কন্যাসন্তান দান করলে সে হয়তো জাহিলিয়্যাহ সময়ের মূর্খদের মতো আচরণ করে। যাদের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

“ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যাসন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকে সে কন্যাসন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়। সে অসহনীয় মনের কষ্টে ক্লিষ্ট হয়।”[১]

১. আল-কুরআন, ৪৩ : ১৭

কিছু পুরুষ তো পুত্রসন্তান জন্ম দিতে না পারার কারণে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে। তারা ভুলে যায় আল্লাহই তাদের তাক্বদীর নির্ধারণকারী—

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

"আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[১]

আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা করে পেয়েছে, পুরুষের বীর্য থেকে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় (আল্লাহর ইচ্ছায়)। এটি শত শত বছর আগে কুরআনের এই আয়াতেই বলা হয়েছে :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

"আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন—পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়।"[২]

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না, যা স্খলিত হয়? অতঃপর সে 'আলাকায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুবিন্যস্ত করলেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।"[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৪২ : ৪৯-৫০
২. আল-কুরআন, ৫৩ : ৪৫-৪৬
৩. আল-কুরআন, ৭৫ : ৩৬-৩৯

প্রথম আয়াতে এমন নির্গমনের কথা বলা হয়েছে যা নিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরুষের বীর্য। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়েছেন, নারী ও পুরুষের সৃষ্টি হয় নুতফাহ থেকে অর্থাৎ পুরুষের বীর্য থেকে। দুই লিঙ্গের পার্থক্য করে দিয়েছে এই নুতফাহ। তাহলে স্ত্রী কন্যাসন্তান জন্ম দিলে তাকে দোষারোপ করা বা কটু কথা কীভাবে বলা যেতে পারে?

অনেক সময় স্বামী বন্ধ্যা হলে দেখা যায় স্ত্রী সামনাসামনি আক্ষেপ করে, কিংবা আকারে-ইঙ্গিতে অন্য পুরুষের প্রশংসা করে বলে, 'সে তার স্ত্রীকে পাঁচটা সন্তান দিয়েছে'। এসব আচরণের মাধ্যমে সে স্বামীর পুরুষত্বে আঘাত করে।

একইভাবে স্ত্রী অনুর্বর হলে দেখা যায়, স্বামী প্রকাশ্যে তাকে বিয়ে করার আফসোস করে বা অন্য কারও কথা টেনে আনে, যে তার স্বামীকে অনেক সন্তান দিয়েছে। এভাবে সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না। সমাধানের পথ তো অন্যদিকে।

প্রথমত, যদি কোনো দম্পতি প্রজননে অক্ষম হন, তবে চিকিৎসকের কাছে সমস্যার কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন অক্ষম হলে তাকে দোষারোপ করা অনুচিত। একজন মুসলিম এ ক্ষেত্রে শান্ত থাকে, আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে।

দ্বিতীয়ত, সমস্যা সমাধানে সম্ভব হলে ইসলামে বৈধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ ﷻ নিরাময় ছাড়া কোনো রোগ পৃথিবীতে পাঠান না। চিকিৎসকদের মতে, শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বন্ধ্যাত্ব নিরাময় করা সম্ভব। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক!

তৃতীয়ত, কোনো নিরাময় না পাওয়া গেলে দুজনের নিরাশ হওয়া অনুচিত। আল্লাহর কাছে দু'আ জারি রাখতে হবে, তিনিই তো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তা ছাড়া সুখ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। শুধু সন্তান আছে এমন দম্পতিদের জন্যই সুখ-শান্তি নির্ধারিত, এমন নয়। দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার—এই ভেবে আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থেকে তারা সবরের সাথে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

আল্লাহই তাঁর বান্দাদের ভরণপোষণ করেন, যাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা রিযক দেন। সন্তানও একধরনের রিযক। আয়িশা রা.-এর কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কমতি ছিল না, তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

আরও কিছু বিষয়

প্রথম অধ্যায়ে আমরা সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন কাটানোর মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছি। সেগুলোর কোনোটি অনুসরণ করা না হলে সংসারে অশান্তি আসতে বাধ্য। হয়তো স্ত্রীকে স্বামী প্রচণ্ড মারে, হয়তো শারীরিক চাহিদা পূরণে তাদের একজন উদাসীন, হয়তো স্বামী ঠিকমতো পরিবারে সময় দেয় না—এ রকম অনেক কিছুই হতে পারে।

দাম্পত্যের সমস্যা এড়িয়ে চলতে হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই একে অপরের অধিকারগুলো জানতে হবে, সম্মান করতে হবে। তবেই তাদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসবে। অজ্ঞতার কারণে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে কোনো দম্পতি আগে থেকেই এসব প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে তাদের অন্তত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা উচিত, যা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সন্ধি করবেন যেভাবে

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্বামীর করণীয়

খুব কম দম্পতি পাওয়া যাবে যাদের মাঝে কখনো মতের অমিল হয়নি—এমন অমিল যা ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের মানসিক শান্তিকে কর্পূরের মতো মিলিয়ে দিয়েছে। হতে পারে এসব মতানৈক্য-কলহ এড়িয়ে যাওয়ার মতো কিংবা অনিবার্য; হতে পারে হঠাৎ উদ্ভূত রেষারেষি কিংবা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। যেমনটিই হোক সেটির সমাধান হিসেবে স্বামী-স্ত্রীকে ইসলাম এমন কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে যেন এসব দ্বন্দ্ব তালাক পর্যন্ত না গড়ায়।

পবিত্র কুরআন পুরুষদের কিছু নির্দেশনা দিয়েছে শুরুতে আমরা সেসব আলোচনা করব। এসব নির্দেশনা মানলে স্ত্রীর সাথে কলহের কারণে বিগড়ে যাওয়া সম্পর্ক সহজেই ঠিক করা সম্ভব, ফিরিয়ে আনা সম্ভব সম্পর্কের মাধুর্য। দ্বন্দ্বের সময় স্ত্রী স্বামীর অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় জেঁকে বসলে পরিস্থিতির চরম অবনতি হতে বাধ্য। এ সময় একজন স্বামীর করণীয় :

- বিচক্ষণতার সাথে স্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া।
- এতে কাজ না হলে বিছানা পৃথক করে তাকে একা ঘুমাতে দেওয়া এবং তার সাথে সব শারীরিক সম্পর্ক বন্ধ রাখা।
- এতেও কাজ না হলে তাকে হাত বা মিসওয়াক দিয়ে মৃদু আঘাত করা।

এই তিনটি ধাপ অবশ্যই ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করতে হবে। যখন একটি ধাপ অনুসরণ করে কোনো ফলাফল আসবে না শুধু তখনই পরবর্তী ধাপে যেতে হবে। এই তিনটি ধাপ অনুসরণ করেও কোনো কাজ না হলে শেষ চেষ্টা হিসেবে মধ্যস্থতাকারী বেছে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন সম্মিলিতভাবে তাদের মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারিণী ওই বিষয়ের যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ করো এবং তাদেরকে (মৃদু) আঘাত করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।

আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট করো। যদি তারা মীমাংসার ইচ্ছা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।"[১]

এই আয়াতগুলো সা'দ বিন রাবী রা. ও তার স্ত্রী হাবিবাহ বিনতে যাঈদ রা.-এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল। স্ত্রীর অবাধ্য আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সা'দ রা. তাকে চড় মেরে বসেন। এরপর হাবিবাহ রা. তার বাবার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তার বাবা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "আমি তাকে আমার আদরের মেয়ের সাথে সংসার করার অনুমতি দিয়েছি, আর সে তাকে আঘাত করল!"

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে স্বামীর ওপর সে অনুরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে।"

সা'দ রা.-এর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা ফিরে যেতে উদ্যত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ ডাকলেন, "ফিরে এসো। জিবরিল আমার কাছে এসেছে।" আল্লাহ ﷻ তখন এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন, "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক..."

তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমরা একটা চেয়েছিলাম, আল্লাহ অন্যটি

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪-৩৫

চেয়েছেন; আল্লাহ যা চান সেটিই উত্তম।”

এভাবে দম্পতির মাঝে প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়।

ওপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ ﷻ স্ত্রীদেরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন,

১. সেই সকল স্ত্রী যারা ধর্মনিষ্ঠ এবং অনুগত (আল্লাহ ও তাদের স্বামীর প্রতি)।

২. সেই সকল স্ত্রী যারা অবাধ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত, যারা শয়তানের বিভ্রান্তিকর ওয়াসওয়াসা মেনে চলে।

প্রথম প্রকারে উল্লেখিত স্ত্রীরা স্বামীদের প্রতি অনুগত। তারা আল্লাহর দেয়া নির্দেশ মেনে চলেন, তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তারা নিজেদের চরিত্র হেফাজত করার পাশাপাশি স্বামীর সম্পদ অপচয় হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। এককথায়, সেসকল স্ত্রী-ই উত্তম যারা তাদের স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত।

দ্বিতীয় প্রকারের স্ত্রী হচ্ছে অবাধ্য নারী। তারা স্বামীর নির্দেশ পালন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। কখনো কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণায় তারা মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের স্ত্রীর সাথে বোঝাপড়ায় প্রথম পদক্ষেপ হলো স্বামী তার সাথে আলোচনা করবে, নাসিহাহ দেবে। যদি এতে কাজ না হয়, তবে স্ত্রীর বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। এই নির্দেশের দ্বারা মূলত স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকাকে বোঝানো হয়েছে যা দ্বারা স্বামীর অসন্তুষ্টি ভালোভাবে প্রকাশ পায়। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, “সে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং শারীরিক সম্পর্ক করতে অস্বীকৃতি জানাবে।”

যদি এরপরেও স্ত্রীর কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন না আসে, সে ক্ষেত্রে স্বামী তাকে হালকা আঘাত করতে পারে। তবে এই আঘাত হতে হবে খুব সামান্য, যার উদ্দেশ্য কেবল স্ত্রীকে বাধ্যগত করা। এতে যেন স্ত্রী কোনো মানসিক আঘাত না পায়; বরং সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সংবিৎ ফিরে পায়।

এতেও কাজ না হলে একজন বিচারক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুজন সালিসি ব্যক্তির সাহায্য নেবেন—একজন স্ত্রীর আত্মীয়ের মধ্যে থেকে এবং অপরজন স্বামীর আত্মীয়ের মধ্যে থেকে। তাদের দায়িত্ব হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদের কারণগুলো খুঁজে বের করা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে তাদের মাঝে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনা।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং তোমাদের স্ত্রীদের বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট করো। যদি তারা মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ।"[১]

কিছু কথা

উপরোক্ত আয়াতের একটি সূক্ষ্ম দিক নিয়ে এখন আলোচনা করব। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"[২]

এখানে بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ অর্থ "তাদের একের ওপর অন্যকে।" কোনো কিছুর "بَعْضٌ" বলতে সম্পূর্ণ কোনো কিছুর অংশবিশেষকে বোঝায়।

অর্থাৎ এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অংশ যারা একে অপরকে পূর্ণ করে। তারা অনেকটা একই শরীরের মাঝে দুইটি আত্মা কিংবা একই শরীরের দুটি অঙ্গের মতো। তারা একে অপরকে সর্বোচ্চ সাহায্য করবে, ঠিক যেমন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহের (শারীরিক ও মানসিক) সুস্থতা বজায় রাখার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করে।

সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রীর জন্যও আলাদা আলাদা কাজ বা দায়িত্ব আছে। চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা। শরীরের পরিপূর্ণ কার্যক্ষমতার জন্য দুটোরই প্রয়োজন। উপরন্তু, শরীরের কিছু অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। যেমন হৃৎপিণ্ড হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; যদিও দুটোই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, প্রত্যেকেরই নিজস্ব আলাদা

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩৫
২. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

আলাদা কাজ রয়েছে। একইভাবে দাম্পত্য বন্ধনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ স্বামীকে স্ত্রীর ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই কেবল শান্তির বন্ধন গড়ে তুলতে পারবে।

স্বামীর নেতৃত্ব ও সমাধান মেনে নিন

বেশির ভাগ প্রজাতিতেই দেখা যায় সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্বটি পুরুষ জীবের ওপর থাকে। আল্লাহ ﷻ এই ফিতরাতের ওপর প্রাণিকুল সৃষ্টি করেছেন। সমাজের মতো পরিবারের দেখভাল ও উন্নয়নের জন্য অভিভাবক হিসেবে পুরুষ দায়িত্ব পালন করে। পরিবার সমাজের মূল একক। যদি পরিবার দ্বীনদারির ওপর সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে তবে সমাজও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে; অন্যথায় কলুষিত হতে বাধ্য।

পুরুষকে আল্লাহ ﷻ নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য পরিবারের কর্তা ও অভিভাবক হিসেবে পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক যোগ্য। প্রশ্ন আসতে পারে, কীভাবে পুরুষেরা নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের দিক থেকে এগিয়ে? উত্তর হলো, আল্লাহ ﷻ তাদের যথার্থ অভিভাবকের মতো শারীরিক ও মানসিক গড়ন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে চায়। একইভাবে নারীর প্রকৃতি হলো, তারা সহযোগিতা ও ভরণপোষণ পেতে চায় (যদি না তার সহজাত প্রকৃতি কলুষিত হয়)। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, নেতৃত্বের উদ্দেশ্য স্ত্রীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ফলানো বা আধিপত্য বিস্তার নয়; বরং এই নেতৃত্ব পুরুষের দায়িত্ব। নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে—এমনটাই মানব ফিতরাত।

সমাজের নেতৃত্বদানে নেতার প্রয়োজন। কিন্তু নেতৃত্ববলে তিনি সমাজের অন্য ব্যক্তিদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যান না। নেতা হিসেবে তার নিজের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি সমাজের অন্যদেরও নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব রয়েছে। নেতা সমাজের উন্নতির জন্য দিন-রাত কাজ করবে এবং অন্যরা তাকে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে।

পরিবারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। পুরুষ চেষ্টা করবে একজন সত্যিকারের নেতার মতো তার দায়িত্বগুলো পালন করার। স্ত্রী চেষ্টা করবে স্বামীকে মেনে চলার,

দায়িত্ব পালনে সাহায্য করার। একজন নেতা ও অভিভাবক হিসেবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনেই আল্লাহ ﷻ পুরুষকে স্ত্রীর ওপর শাসন করার অধিকার দিয়েছেন।

ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য বলে, 'ইসলাম নারীদের আঘাত করার অধিকার দিয়ে তাদের অপমান করেছে।' তারপর এই আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়, "তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ করো এবং তাদেরকে (মৃদু) আঘাত করো।"[১]

এরপর তারা সবাইকে শুনিয়ে বলতে চায়, "এটা কি নারীর সম্মান ও মর্যাদার অবমাননা নয়?"

আমাদের উত্তর হলো, এটা সত্য যে, আল্লাহ ﷻ কুরআনে পুরুষদের অনুমতি দিয়েছেন তাদের স্ত্রীকে আঘাত করার; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ক্ষেত্রে? কখন তাকে আঘাত করা যাবে? তাকে আঘাত করার আগে কোন কোন শর্তগুলো পূরণ করতে হবে? আঘাত করার সর্বোচ্চ সীমা কতটুকু?

প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে, এখানে আঘাত করার উদ্দেশ্য তাকে শোধরানো। এ ছাড়া বাকিসব ক্ষেত্রে আঘাত করা নিষিদ্ধ। এর তুলনা করা যায় রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ সেবনের সাথে—শুধু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ওষুধ প্রযোজ্য। যখন কোনো নারী তার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতেই থাকে, সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়, ভুল পথ থেকে ফিরে আসতে চায় না, তখন তার স্বামীর কী করা উচিত? তাকে তালাক দেয়া, তার যা ইচ্ছা তা-ই করতে দেয়া, নাকি তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা?

কুরআন আমাদের এ সমস্যা নিরসনের পথ দেখিয়েছে। স্ত্রীকে অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে ইসলাম পুরুষকে শিখিয়েছে প্রাজ্ঞ সমাধান। প্রথমত স্বামীকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে, এরপর স্ত্রীকে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতে হবে; এসবে কাজ না হলে তার বিছানা ত্যাগ করতে হবে। যদি তাতেও কাজ না হয়, তবে মৃদু আঘাত করতে হবে।

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার চেয়ে মিসওয়াক দিয়ে আঘাত করা উত্তম। কারণ, তালাক পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। দুটি ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য হলে কম ক্ষতিকর পদ্ধতিটিই অনুসরণ করা উচিত।

---
১. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

এই বিধান নারীদের কোনোভাবেই অপমান করেনি। এটি স্ত্রীকে শোধরানোর উদ্দেশ্যে একেবারে শেষ পদক্ষেপ। এই মৃদু আঘাত শুধু নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরনের নারীর ওপর প্রযোজ্য, যারা স্বামীর অবাধ্যতা করতেই থাকে। নরমভাবে সতর্ক করার পরও ভুল পথ থেকে ফিরে আসতে চায় না। কিছু মানুষ থাকেই যাদের শাস্তি না দিলে শৃঙ্খলা শেখানো যায় না। এই কারণেই ইসলাম মদ্যপানসহ বিভিন্ন পাপ কাজের জন্য শাস্তির বিধান রেখেছে।

তবে আমাদের সালাফগণ স্ত্রীদের আঘাত করার বিষয়টি বেশ অপছন্দ করতেন। 'আতা রহ. বলেছেন, "স্ত্রীকে আঘাত করা উচিত নয়, এমনকি তাকে কোনো আদেশ বা নিষেধ করার পর সেটা না শুনলেও; বরং তার ওপরে রাগান্বিত হওয়াই যথেষ্ট।" এরপর তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন, পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের আঘাত করার অনুমতি দেয়ার পরপরই ৭০ জন নারী তাদের স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। যারা স্ত্রীদের আঘাত করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়।"[১]

এতকিছুর পরেও যারা এই বিধানের ব্যাপারে ইসলামকে আক্রমণ করে, তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ যে, স্ত্রীকে আঘাত করার বিষয়টি একটা প্রতিকারমাত্র—যা একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রযোজ্য।

...فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

"অতএব ওই সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে, তারা কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না!"[২]

ইসলাম স্ত্রীকে আঘাত করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা দিয়ে রাখেনি; বরং আগের উল্লেখিত ধাপগুলো আশানুরূপ ফল না দিলে এমনটি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি স্বামী যদি জানে, স্ত্রীকে আঘাত করে শেষ পর্যন্ত কোনো উন্নতি হবে

১. আবু দাউদ (২১৪৬), ইবনে মাজাহ (১৯৮৫), দারিমি (২২১৯) এবং ইবনে হিব্বান (৪১৭৭)
২. আল-কুরআন, ৪ : ৭৮

না, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে আঘাত করা অনুচিত।

আঘাত করার ব্যাপারে আরও বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।

স্ত্রীকে গুরুতর বা হিংস্রভাবে স্বামী আঘাত করতে পারবে না। সে চাবুক কিংবা লাঠিও ব্যবহার করতে পারবে না; কেবল মিসওয়াক দিয়ে খোঁচা বা মৃদু আঘাত করতে পারবে যেন তার শরীরের কোনো ক্ষতি না হয়, কোনো দাগ না থাকে। তার মুখমণ্ডলেও আঘাত করা যাবে না।

ওপরের এই বর্ণনা শুধু সেসব অমুসলিমদের যুক্তি খণ্ডনের জন্যই নয় যারা ইসলামের ওপরে অপবাদ দিতে চায়; বরং সেসব মুসলিমদের জন্যও কঠোর উপদেশ, যারা অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে এবং মনে করে স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামতো মারধর করা তাদের অধিকার। তারা অবশ্যই ভুল পথে আছে। ইসলাম কোনোভাবেই তাদের এ জঘন্য কাজ সমর্থন করে না।

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্ত্রীর করণীয়

কোনো মানুষই আদর্শ নয়। তবে প্রত্যেককেই আদর্শ হবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে নারীর উচিত বাস্তববাদী হওয়া। যে স্বামীর সাথে সে ঝগড়ায় লিপ্ত, সেই স্বামীর সাথেই তাকে এক বাড়িতে থাকতে হবে, চলতে হবে, ভালোবাসা ও সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হবে। দিনশেষে স্বামী তার দেহ-মনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তার কাছেই আবার ফিরে আসতে হবে। তাই খেয়াল রাখতে হবে, সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীর দৌড় দেখে নেওয়ার জিদ যেন নারীর ওপর চেপে না বসে।

বরং যেকোনো কলহে দুজনকেই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মনে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণা তৈরি হওয়ার আগেই মতভেদ মিটিয়ে ফেলার জন্য তাদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, কঠোর শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আলাপের মাধ্যমে সমাধানে আসতে হবে।

তর্কের সময় কঠোর ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারে সাবধান হোন! কলহ শেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় পরেও এই কথাগুলো মানুষের হৃদয়ে ক্ষতরূপে থেকে যায়—পরবর্তী ঝগড়া সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত সেসব সুপ্ত থাকে। অন্যদিকে পুরোপুরি চুপ থাকা সাময়িকভাবে

পরিস্থিতির উন্নতি ঘটালেও অনেক সময় তর্ককে পিছিয়ে দেয়; সুযোগ পেলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। এজন্য একদম চুপ না থেকে পরিস্থিতি শান্ত হলে নরম ভাষায় সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন।

কিছু নারী আরেক ধাপ এগিয়ে থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ স্বামীর সাথে কথা বলে না এই আশায়, স্বামী হেরে গিয়ে ফিরে আসবে। আবার স্বামী আগ বাড়িয়ে সমঝোতায় আসতে চাইলে তারা ঔদ্ধত্য দেখায়, তার ভুলগুলো মনে করিয়ে দেয়। এসব আচরণ কোনো সমাধান তো আনেই না, বরং জটিল পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তোলে।

তাহলে একজন নারীর কী করা উচিত? তাকে চেষ্টা করতে হবে তর্কের শুরু থেকেই উত্তেজনা কমানোর। এজন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথম পদক্ষেপ :

তাকে বুঝতে হবে, এটা সত্যিই কোনো মতভেদ নাকি সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি। এই দুটোর পার্থক্য আছে। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বোঝাপড়ায় কমতি আসে, একে অপরের অনুভূতি বুঝতে পারে না। ভুল বুঝে তারা আচরণ করে, উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়—এভাবে ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝি বড় ঝগড়ায় রূপ নেয়।

এ কারণে উভয়ের অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে, যেন কোনো বিভ্রান্তির সুযোগ না থাকে। খোলাখুলি মনের কথা অপরকে জানালে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। এতে দুজনেই বুঝতে পারে, তাদের মাঝে আসলে কোনো মতভেদ নেই। তারা কেবল কিছু সময়ের জন্য একে অপরকে ঠিকভাবে বুঝতে পারছিল না।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ :

যদি সত্যিই তাদের মাঝে মতভেদ থাকে, তবে সেটার মূল কারণ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করবে স্ত্রী। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে হবে; নতুবা পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে মোড় নেবে। স্বামীর অতীতের ভুলগুলো উল্লেখ না করে বরং মূল সমস্যার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অতীতের কথা বললে শুধু তর্কই বাড়বে, যে সমস্যার কারণে তাদের মনোমালিন্যের শুরু সেটি অধরাই থেকে যাবে। সমস্যা সমাধানে দুপক্ষকেই সমঝোতায় আসতে হবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ :

এই ধাপে এসে স্ত্রী শুধু নিজের ব্যাপারেই কথা বলবে, কেবল নিজের আবেগ প্রকাশ করবে। যদি সে স্বামীর আচরণের ব্যাপারে কথা বলে, স্বামীর উদ্দেশ্য নিয়ে মন্তব্য করে, স্বামীর মনে হবে তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। ফলে সে আত্মপক্ষ সমর্থন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এমনকি সমঝোতার জন্য সে নিজের অবস্থান থেকে কোনোভাবেই ছাড় দিতে চাইবে না।

স্ত্রী যখন নিজের ব্যাপারে কথা বলে, তখন স্বামীকে সে তার আবেগ-অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে জানার সুযোগ করে দেয়। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি, তার পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি জানিয়ে দিলে পরবর্তী সময় স্বামীর জন্য তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়। নতুন মনোমালিন্য তৈরির সম্ভাবনা কমে যায়।

চতুর্থ পদক্ষেপ :

যে বিষয়গুলোতে দুজনেই একমত সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোর ওপর জোর দিতে হবে। সহমত তাদের মাঝে সুমধুর সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে এবং যেকোনো মতভেদ মাথাচাড়া দেওয়ার আগেই সমাধান করে ফেলতে সাহায্য করে। যখন দুজনেই একে অপরের ভুলগুলোর দিকে আঙুল তোলে আর নিজের আচরণের জন্য অজুহাত দাঁড় করায়, তখন তাদের মাঝে মনোমালিন্য আরও গুরুতর ও দীর্ঘতর হয়।

পঞ্চম পদক্ষেপ :

পুরোপুরি সমঝোতায় আসার জন্য তাদের দুজনকে এগিয়ে আসতে হবে; বিন্দুমাত্র অসন্তোষ বা তিক্ততা বুকে জমে রাখা যাবে না। দুজনের একজনও যদি অসন্তুষ্ট থাকে, তবে সমঝোতা আসবে না—এটা হবে কেবল ভগ্নহৃদয়ে যুদ্ধবিরতির মতো। খুব অল্প সময়ের মাঝে আবার বিবাদ দরজায় কড়া নাড়বে। এজন্য সব অসন্তোষ-তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে মনকে ধুয়ে ফেলতে হবে। সারা জীবনের সঙ্গীর জন্যই তো এ সমঝোতা!

ষষ্ঠ পদক্ষেপ :

বোঝাপড়া গড়ে ওঠার সাথে সাথেই দুজনকে সমঝোতার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে লেগে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু মুখের কথা কখনোই যথেষ্ট নয়, বরং সেগুলো

কাজের মাধ্যমে করে দেখাতে হবে।

ঘটনাটা সালমান আল-ফারিসি রা.-এর। তিনি কিনদাহ্ গোত্রের এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। একদিন তিনি সালাম দিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন, তারপর আসন গ্রহণ করে বললেন, "আমি যদি তোমাকে কিছু করার জন্য নির্দেশ দিই তবে তুমি কি তা পালন করবে?" তার স্ত্রীর জবাব শুনুন! তিনি বললেন, "আপনি এখানে রাজার মতো, আপনার প্রতি অনুগত থাকতে আমি বাধ্য।" বর্তমান সময়ের বহু নারীর জন্য এই দ্বীনদার নারীর কাছ থেকে দাম্পত্যের কৌশল শেখার আছে!

আজকাল উন্নত দেশগুলোয় মানুষ প্রযুক্তিগত অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি মানুষের বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে ব্যর্থ। বর্তমানের অগণিত দাম্পত্যের বিবরণ দিতে গেলে ঘুরেফিরে দুর্দশা, দুর্ভাগ্য, দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা এই শব্দগুলোই সামনে আসবে।

আজ পুরুষেরা জানে না, কীভাবে স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে হয়। নারীরা জানে না, কীভাবে স্বামীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হয়। অথচ শত শত বছর আগের এমন এক নারীর উদাহরণ আমরা দেখলাম যিনি জানতেন কীভাবে পরিবারে শান্তি আনতে হয়। কত সুমিষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, "আপনি এখানে রাজার মতো, আপনার প্রতি অনুগত থাকতে আমি বাধ্য।" এ ধরনের কথায় যেকোনো বিবেকবান পুরুষের রাগ গলে পানি হতে বাধ্য।

এজন্য বেশির ভাগ দাম্পত্য সমস্যার কার্যকরী সমাধান হলো, দম্পতির প্রত্যেককেই একে অপরের প্রতি দয়ালু হতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রেমময়ী নারী প্রথম পদক্ষেপ নিলে আরও ভালো। আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কি তোমাদের জান্নাতী পুরুষদের ব্যাপারে জানাব না?"

সাহাবীগণ বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ!"

তিনি ﷺ বললেন, "নবী জান্নাতী, আস-সিদ্দীক জান্নাতী... যে মুসলিম কেবল আল্লাহর জন্য শহরের শেষ মাথায় তার ভাইকে দেখতে যায়, সে জান্নাতী। আমি কি তোমাদের জান্নাতী নারীদের ব্যাপারে জানাব না?"

সাহাবীগণ বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ!"

"প্রত্যেক প্রেমময়ী-উর্বর নারী যখন সে রেগে যায় বা সে কষ্ট পায় বা তার স্বামীর অবাধ্য হয়, তারপর সে (স্বামীকে) বলে, 'এই আমার হাত আপনার হাতে, আপনি (আমার ওপর) সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখ ঘুমাবে না।'"[১]

ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন, যিনি মানবজাতিকে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকারী বিষয়গুলো শিখিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ একজন স্ত্রীকে কত মধুর কথা বলা শিখিয়ে দিয়েছেন! যে কথাগুলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে শান্তি-সুখ সঞ্চার করবে!

প্রিয় দ্বীনী বোন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উপদেশ কাজে লাগানো আপনার জন্য কঠিন মনে হতে পারে। এর কারণ হয়তো আপনার মনের অহংকার। অথবা আপনার স্বামী এ ধরনের সম্মান লাভের যোগ্য তা আপনি মনে করেন না। জেনে রাখুন, এভাবে শয়তান আপনাকে বিভ্রান্ত করছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ তৈরি করতে পারলেই সে খুব খুশি হয়।[২]

তাই দেরি না করে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন, তাকে খুশি রাখার ওয়াদা করুন। এতে খুব সহজেই আপনাদের দ্বন্দ্বগুলো আপনি দূর করতে পারবেন। জেদি আচরণ কারও জন্যই ভালো ফল বয়ে আনে না। বরং আপনার ক্ষমা প্রার্থনায় পুরুষের হৃদয় মোমের মতো গলে যাবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে সব অন্তরের অবস্থান।

---

১. তাবারানি তার আস-সগীর আল-আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর রাবীদের মাঝে ইবরাহীম বিন যিয়াদ আল-কুরায়েশী রয়েছে। বুখারী তার সম্পর্কে বলেন, 'তার হাদিস সহীহ নয়।' যদি তিনি এর দ্বারা তাকে দুর্বল বোঝাতে চাইতেন তবে এ বিষয়ে আমাদের আর কিছুই বলার থাকত না। কিন্তু তিনি সম্ভবত তার (ইবরাহীম বিন যিয়াদ) থেকে বর্ণিত বিশেষ কোনো অগ্রহণযোগ্য একটি হাদিসকে বোঝাতে চেয়েছেন (কোন হাদিস তিনি তা উল্লেখ করেননি)। অন্য রাবীগণ বিশ্বস্ত। [মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ (৪/৩১২)]

২. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ইবলিস পানির ওপর তার আসন স্থাপন করে, তারপর তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এদের মাঝে তার সর্বাধিক নৈকট্য সে-ই অর্জন করে, যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের একজন এসে বলে, 'আমি অমুক অমুক কাজ করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করতে পারোনি।' আরেকজন এসে বলে, 'অমুককে আমি যতভাবে পারা যায় ধোঁকা দিয়েছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, তুমি কত চমৎকার!'" [মুসলিম (২৮১৩), আহমাদ (৩/৩১৪, ৩৩২, ৩৫৪, ৩৬৬, ৩৮৪)]

ইচ্ছামতো তিনি সেগুলো পরিবর্তন করেন।"[১]

ভেবে দেখুন, অসুস্থ হলে মানুষ সুস্থ হওয়ার জন্য তিক্ত ওষুধ খেতেও রাজি থাকে। "এই আমার হাত আপনার হাতে, আপনি (আমার ওপর) সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখ ঘুমাবে না" এই কথাগুলো বলা হয়তো আপনার কাছে তিক্ত ওষুধের মতো। কিন্তু এই ওষুধ আপনাদের মাঝের সমস্যাগুলো মিটিয়ে দেবে।

এ রকম ঘটনা বহুবার ঘটতে দেখেছি, দম্পতির মতবিরোধ প্রায় তালাক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমন সময় স্ত্রী তার নিজের ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়েছে। ফলে তাদের মাঝে শান্তি ফিরে এসেছে।

সম্মানিত বোন, এই দৃষ্টান্ত স্থাপনে আপনার হারাবার কিছুই নেই। হারাতে হবে কেবল অহংকার ও জেদ—যে দুটো হারানো আপনার জন্য বরং কল্যাণকর!

ভুলের ওপর অটল থাকতে শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দেবে, "তোমার স্বামীর জন্য তুমি কত কিছু করো! অথচ খুব কমই সে তোমার কদর করে!" যখনই আপনার মনে এ ধরনের চিন্তা আসবে, বুঝে নেবেন, আপনার শত্রু আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

"সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়, মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদের কেবল প্রতারণার প্রতিশ্রুতিই দেয়।"[২]

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে, তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো না; বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"[৩]

সম্মানিত বোন, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর এই আনুগত্য সত্ত্বেও আপনার স্বামী

১. উল্লেখিত অংশটি তিরমিজি (২১৪০) এবং হাকিমে (১/৫২৬) বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ (৪/১৮২) এবং হাকিমেও (১/৫২৫) এই হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর রাবীগণ নাওওয়াস বিন সাম'আন রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২. আল-কুরআন, ৪ : ১২০

৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৭৫

যদি সমঝোতায় ইচ্ছুক না হয়, অন্তত এটা ভেবে আপনি নিজে শান্তিতে থাকবেন যে, আপনার পক্ষে সম্ভব করণীয় সব চেষ্টাই আপনি করেছেন।

মু'আয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে, স্বামী অপছন্দ করে এমন কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে। তাকে ছাড়া তার ঘরে অন্য কারও কথা মানবে, স্বামীর সাথে রাগ করবে, তার বিছানা ছেড়ে থাকবে বা তাকে আঘাত করবে; যদিও স্বামী অধিক জালিম হয়, যতক্ষণ না স্ত্রী তাকে খুশি করে। যদি স্বামী তার ওপর খুশি হয়ে যায় এবং তাকে গ্রহণ করে নেয় তবে তো ভালোই—আল্লাহও এই স্ত্রীর ত্রুটি ক্ষমা করবেন, তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেবেন, তার পাপ মোচন করবেন। কিন্তু স্বামী শেষমেষ যদি অখুশিই থাকে, তবু সে তার চেষ্টাকে অজুহাত হিসেবে পেয়ে গেল।"[১]

জিদ ও অহংকার এ দুটোকে পুরুষেরা নারীর মাঝে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। কোনো নারীর মাঝে এসব উচ্চমাত্রায় থাকলে তার স্বামী তাকে তালাক দেওয়ার কথা খুব সম্ভবত মনে মনে একাধিকবার ভেবে ফেলেছে। অহংকার, জিদ ও ঔদ্ধত্যের কারণে অনেক মেয়ে তালাকের মুখ দেখে। এই বিধ্বংসী আচরণের কারণে তাদের দিন-রাত এমনকি বছরের পর বছর কাটে একাকী, পরিত্যক্ত অবস্থায়। অন্যদিকে সহজ-সরল-নম্র-মমতাময়ী নারীদের দিনগুলো থাকে স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত।

স্ত্রী হিসেবে আপনার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বামীকে আপনার ভালোবাসার কথা জানানো। এটা শুধু কথায় নয়, বরং কাজেও প্রমাণ করে দেখাতে হবে। স্বামী কোনো ভুল করে বসলে সেটার ব্যাপারে কোনো অজুহাত বের করে মনকে প্রবোধ দিন। যেমন ধরুন, স্বামী হয়তো আপনার সাথে রাগারাগি করেছে—এর কারণ হয়তো তার কর্মস্থলে আজ প্রচণ্ড ক্লান্তিকর একটি দিন কেটেছে। একইভাবে স্বামী কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তাকে কটূক্তি করবেন না; বরং তাকে সান্ত্বনা দিন, তার হাতে হাত রেখে উৎসাহ দিন।

১. হাকিম (২/১৯০) এবং তাবারানি দুইটি সনদে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত। [মাজমা' আয-যাওয়া'ইদ (৪/৩১৩)]

ধরুন, আজকের যুগে কোনো লোক বাসায় ফিরে স্ত্রীকে বলল, "আগামী কিছুকাল চলার মতো আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। চিন্তা করছি, বছরখানেকের জন্য চাকরি থেকে ছুটি নেব। এ সময় বিদেশে গিয়ে আরবি ভাষা শিখব, তাহলে আরও ভালোভাবে কুরআন বুঝতে পারব।"

ভাবুন তো, এতে বেশির ভাগ স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? কোনোরূপ অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে পারি, বেশির ভাগ স্ত্রীই স্বামীকে নিরুৎসাহিত করবে। অনেকের মুখে শোনা যাবে— 'এক বছর কাজে ছুটি নেয়া মূর্খতা', 'সে পাগল হয়ে গিয়েছে', 'ভাষা শেখা মুখের কথা?' স্বামীর অনুভূতি বিবেচনা না করেই তারা এ ধরনের কথাগুলো বলবে। অথচ তার স্বামী হয়তো সত্যিকার অর্থেই এমনটা করতে চেয়েছিল, হয়তো এতেই সে সফলতার আনন্দ পেত।

চলুন, উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রা.-এর উদাহরণ দেখি। নির্জনে দীর্ঘ সময় আল্লাহর ইবাদাত করে তার স্বামী রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরতেন। এরপর একদিন হঠাৎ তিনি ﷺ প্রথমবারের মতো ওহী পেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি প্রচণ্ড অস্থির ও হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। এমন পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ নারীই বিরূপ আচরণ করত। অথচ খাদিজা রা. রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বললেন? তিনি বরং সাহস দিয়ে বললেন,

"আল্লাহর কসম, কখনোই নয়। আল্লাহ ﷻ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন, পথের দুর্দশাগ্রস্ত মুসাফিরকে সাহায্য করেন।"[১]

এই কথাগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সব প্রজন্মের মেয়েদের জন্য এ এক অনন্য উদাহরণ। খাদিজা রা. তার চিন্তার গভীরতা, হৃদয়ের শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য চিরকাল সবার অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন।

১. বুখারী (৩) এবং মুসলিম (১৬০)

দ্বন্দ্বের সময় পাঁচটি মারাত্মক ভুল

১. মনের কথা ও অনুভূতি চেপে রাখা

তর্কের সময় স্বামীর সমালোচনা শুনে একেক নারী একেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিছু নারী সবকিছুর পালটা জবাব দেয়, আঘাতের বদলে আঘাত করে, খোঁচার বদলে খোঁচা দেয়, তিক্ত সমালোচনার বদলে তিক্ত সমালোচনা করে।

অন্যদিকে কিছু নারী এমন থাকে যখন স্বামী তাদের ওপর চিৎকার করে, তখন তারা নিষ্ক্রিয় থাকে, চুপচাপ তার সব কথা শুনে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এটাই একজন নারীর জন্য সঠিক কাজ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে মোটেও এটা উপকারী নয়। এর ফলে পরিস্থিতি বাড়াবাড়ির সীমা পার করতে পারে। শেষমেশ নারীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে তার আবেগ বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসবে, জিহ্বার সবটুকু বিষ স্বামীর ওপর ছুড়ে দিয়ে তবেই সে শান্ত হবে।

এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা হলো আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। স্ত্রী প্রথমে নিজের আবেগকে খেয়াল করবেন, তারপর দ্বন্দ্বের মূল উৎস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবেন। এরপর তার অনুভূতি অকপটে, শান্ত ও নম্রভাষায় স্বামীকে জানাবেন। কোনো সমস্যা তৈরি হলে সেটি থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে কোনো ফায়দা আসে না। এটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। বরং আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

২. দ্বন্দ্বের মাঝে অন্যকে ডেকে আনা

আরেকটি বড় ভুল হলো, সংসারের কলহে বাইরের কাউকে ডেকে আনা। পরিস্থিতির চরম অবনতি না হওয়া পর্যন্ত বিচক্ষণ স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই পারিবারিক সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, আরেকজনের সামনে নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা প্রকাশ পেলে দুজনেই নিজ নিজ সম্মান বাঁচাতে একরোখা হয়ে পড়ে। সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নিজেকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টায় দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি সন্তানদেরও বুঝতে হবে, তাদের পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো একান্তই তাদের নিজেদের। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজখবর

নিতে ইসলামেও নিষেধ করা হয়েছে। এটি অবশ্যই কোনো সম্মানজনক কাজ নয়। পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট করলে পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বাইরের অধিকাংশ মানুষই গোপনীয়তা রক্ষা করে না—কারও পরিবারের সমস্যার কথা জানামাত্র তারা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে পরিবারটি সমাজে গীবত-গুজব, তাচ্ছিল্য আর করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিছু মানুষ তো দিন-রাত গীবতের মাঝেই ডুবে থাকে, তাদের মুখে মুখে পরিবারটি নিয়ে সরস গল্প চলতে থাকে।

এই মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পরিবারের গোপনীয়তার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কখনো হয়তো এই দম্পতির সমস্যা সমাধানে সালিসি ব্যক্তির সহযোগিতা নেওয়া প্রয়োজন পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে, তাদের সমস্যার কথা যতটা সম্ভব কম মানুষ যেন জানে।

সালিসির ক্ষেত্রে দম্পতির এমন কারও শরণাপন্ন হওয়া উচিত যিনি তার দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা, নিজ প্রজ্ঞা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সুপরিচিত। আল্লাহর ইচ্ছায় এ ধরনের মানুষরা সহজেই সমাধান দিতে পারেন। গোপনীয়তা অবলম্বন করে বিশ্বস্ত-জ্ঞানী মানুষের শরাণাপন্ন হলে যেমন সমাধানে সহজে পৌঁছানো যায়, তেমনি পরিবারের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

৩. তুচ্ছ কারণে আদালতে যাওয়া

কিছুকাল আগেও মুসলিম পরিবারগুলো তালাকের একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আদালতে পা মাড়াত না। তাদের কাছে পরিবারের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি—তাই মনোমালিন্য হলে নিজেরাই আপসের চেষ্টা করতেন। পরিস্থিতি চরমে গেলে কেবল তবেই আদালতের শরণাপন্ন হতেন।

অথচ এখন সমস্যা সমাধানে মানুষ নিজেরা একটুও চেষ্টা করে না; খুব তুচ্ছ বিষয়ে আদালতে দৌড়ায়। কিন্তু আদালতে গিয়ে সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়। অনেকটা যেন গরম লোহার ছেঁকা দিয়ে চিকিৎসা করার মতো ব্যাপার—যাতে উপকার হয় খুব সামান্যই।

দুপক্ষই নিজ নিজ অধিকারের দাবি বেশ গুছিয়ে বিচারকের কাছে নিয়ে যায়। অথচ ভুলে যায়, সব অধিকার এক রকম নয়। একজন ব্যবসায়ীর অধিকার এক রকম,

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আরেক রকম। ব্যবসায়ীর অধিকার নষ্ট হলে বিচারকের কাছে তিনি সঠিক বিচার হয়তো-বা পেতে পারেন, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সমাধান পাবার তেমন কিছুই আদালতে নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব বিচারের নিষ্পত্তি হয় তালাকের মাধ্যমে, হয়তো-বা কিছু ক্ষতিপূরণের ফয়সালা দেওয়া হয়; কিন্তু পরিবার ভাঙার ক্ষতির তুলনায় সেটি কিছুই না!

বেশির ভাগ দাম্পত্য সমস্যা নিজেরাই সমাধান করা সম্ভব। আদালত এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলো চাপ প্রয়োগ করে কিংবা আদালতের আদেশ নিয়ে সমাধান করা যায় না। বরং পারিবারিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বীনদারি ও বিচার-বিবেক খাটানো। পরিস্থিতি খুবই খারাপ হলে শরণাপন্ন হতে হবে পরিবারের কোনো অভিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে; যিনি তাদের তালাকের দিকে নয়, বরং সমাধানের দিকে নিয়ে যাবেন।

অন্যদিকে আদালতের প্রকৃতি স্বামী-স্ত্রীর তালাকের অনুকূলে কাজ করে, সমাধানের জন্য খুবই প্রতিকূল পরিবেশ সেখানে। আদালতের পুরো পথটা অনেক বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ। সেখানে পরিবারের সমস্যায় কেউ জিতে না; বরং উল্টো সবাই দুর্ভোগে ভোগে।

এজন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপসের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই কেবল সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান করা যাবে। আর সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

৪. অপরের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা

রাগের মাথায় স্ত্রী হয়তো এমন কথা বলে বসে যা তার স্বামীর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে, তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। হয়তো স্বামীকে তার দুর্বল চরিত্রের জন্য স্ত্রী দোষারোপ করে বসে। এ ধরনের সমালোচনা তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়, ঘরের বাইরে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলায় একটুতেই সে ভেঙে পড়ে। জীবনসঙ্গিনীর কথা নিজের অজান্তে বিশ্বাস করতে শুরু করে, নিজেকে ব্যর্থ মানুষ মনে হতে থাকে।

কথা এমন এক তির যা একবার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

তাই শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে, বিশেষ করে রাগের মাথায় খুব সাবধান থাকতে হবে। অনেক স্ত্রী স্বামীর সমালোচনায় বেশ পারদর্শী। স্বামীর সমালোচনাকে তারা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সরাসরি স্বামীর মর্যাদায় আঘাত করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, অন্যের স্বামীর গুণ ফুলেফেঁপে বর্ণনা করে স্বামীকে আরও ছোট করার চেষ্টা করে। স্বামীর ওপর মানসিক অত্যাচার করে।

অন্য কারও স্বামীর সাথে তুলনা একজন স্বামীর জন্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর সমালোচনা। হয়তো স্ত্রী তুলনা করতে গিয়ে বলে বসে, "আপনি তো অমুকের মতো আয় করতে পারেন না", "অমুক তার স্ত্রীকে সুন্দর বাসা কিনে দিয়েছে, আপনি তো সে রকম করেন না", "অমুক তার স্ত্রীর জন্য কতকিছু করে, আপনি তো আমার জন্য কিছুই করেন না"—এমন আরও অনেক কিছু। একজন আদর্শ স্ত্রী স্বামীর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে এমন আচরণ থেকে সব সময় দূরে থাকেন।

৫. সন্তানদের সামনে ঝগড়া করা

পিতা-মাতার কলহ সন্তানদের ওপর প্রভাব ফেলে। তারা শান্তি ও নিরাপত্তার অভাববোধ করে। দীর্ঘদিন এমন পরিবেশে থাকলে তাদের মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজেই শিশুদের সামনে কলহ-বিবাদ, রাগারাগি, চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে বাবা-মায়ের সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

শেষ কথা

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশা করছি, আল্লাহর ইচ্ছায় দাম্পত্য-কলহের কারণ ও প্রতিকারগুলো সঠিকভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। এই লেখার ভালো দিকগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভুলগুলো আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

... وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

"আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেসব কাজ করি যা হতে তোমাদের নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়। আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে। আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।"[১]

এর মধ্য দিয়েই শেষ হলো আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহর জন্য।

১. আল-কুরআন, ১১ : ৮৮

২য় অংশ

অনুবাদকের কথা

প্রতিটি জিনিস ব্যবহারের স্বতন্ত্র নিয়মকানুন থাকে। ওই নিয়মকানুন মেনে চললে জিনিসটি থেকে মানুষ পূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারে এবং সহজেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আসলে যেকোনো জিনিস থেকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি। যদি নিয়মকানুন মেনে জিনিসটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং জিনিসটি ব্যবহারের পেছনে বর্তমান লক্ষ্যও অর্জিত হয়। আর নিয়মকানুন মানা না হলে তা হয় না, অনেক চেষ্টা করলেও না। ডাক্তার রোগীকে যে ব্যবস্থাপত্র দেন, তা যদি রোগী আংশিকভাবে অনুসরণ করে বা একেবারেই অনুসরণ না করে, তাহলে সে ওই ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে না এবং ওই ব্যবস্থাপত্র গ্রহণের পেছনে তার যে লক্ষ্য বিদ্যমান অর্থাৎ সুস্থতা অর্জন করা, তা-ও সে অর্জন করতে পারে না। ডাক্তার যে ওষুধ দিনে একবার খেতে বলেছেন তা যদি সে দিনে তিনবার খায়, যে ওষুধ এক চামচ করে খেতে বলেছেন তা যদি সে পাঁচ চামচ করে খায়, যে ওষুধ ভরা পেটে খেতে বলেছেন তা যদি সে খালি পেটে খায়, তাহলে এ রোগী কি সুস্থ হতে পারবে? ডাক্তার যত ভালোই হোক, ওষুধ যত উন্নতমানেরই হোক, নিয়মকানুন না মানার কারণে এই ডাক্তার ও তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র থেকে সে উপকৃত হতে পারবে না এবং তার সুস্থ হওয়ার লক্ষ্যও অর্জিত হবে না। এর জন্য দায়ী কেবল নিয়মকানুন না মানা। এই উদাহরণ প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেমতে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে সুখী ও সফল হওয়ার জন্যও নিয়মকানুন আছে, যা মেনে চললেই কেবল দাম্পত্য জীবনে সুখী ও সফল হওয়া সম্ভব; নতুবা নয়। সংসারে যদি থাকে সম্পদের ছড়াছড়ি, স্ত্রীর রূপ যদি

হয় অপরূপ, বসবাসের বাড়ি যদি হয় বড়ই জাঁকজমকপূর্ণ, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যদি থাকে আভিজাত্য ও বংশকৌলীন্য, সমাজেও যদি তাদের থাকে সম্মানজনক অবস্থান; তবু শুধু নিয়মকানুন মেনে চলার অভাব এমন একটি বিষয়, যা দাম্পত্য জীবনের সুখ, আনন্দ ও সফলতা সবকিছু থেকে তাদের করে রাখতে পারে চিরবঞ্চিত। এমন সংসারে ভাঙন দেখা দিলে তা আশ্চর্যের কিছু নয়; বরং এর ভূরিভূরি প্রমাণ আপনি চারপাশে চোখ বোলালেই দেখতে পাবেন। আপনি দেখতে পাবেন, যে সংসারে সুখশান্তির বন্যা বয়ে যাবে বলে মানুষ আশা করেছে, ওই সংসারই এমন ভাঙনের শিকার হয়েছে যে, তা আর জোড়া লাগানো যাচ্ছে না। সকলের চেষ্টাই তাতে ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। আবার আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখবেন, বহু দরিদ্র ও মর্যাদাবঞ্চিত দম্পতি তাদের অভাবের সংসারে সুখেই কালাতিপাত করছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, সংসারে সুখ ও সফলতা আনার চাবিকাঠি ধনসম্পদ নয়, রূপলাবণ্য নয়, বংশকৌলীন্য নয়, মানমর্যাদাও নয়; বরং শুধু নিয়মানুবর্তিতা। নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি যদি সেগুলোও থাকে, তাহলে সোনায় সোহাগা।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাপবিত্র গ্রন্থে দাম্পত্য জীবনের নিয়মকানুন বর্ণনা করলেন কেন? কারণ, এ ছাড়া সুখ ও সফলতা সোনার হরিণ হয়ে থাকবে। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন কেন? কারণ, এ ছাড়া দম্পতি কখনো দেখবে না সুখ ও সফলতার মুখ।

নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা তো স্পষ্ট হলো। এখন প্রশ্ন হলো, এসব নিয়মকানুনের উৎস কী হবে? কোথা থেকে নেওয়া হবে এসব নিয়মকানুন? এগুলো কি আমাদের বা বিবাহ-উদ্যোগী বর-কনেকে বা তাদের অভিভাবকদের তৈরি করে নিতে হবে? না, তা নয়। নিয়মকানুন তো দেওয়াই আছে। যা বিদ্যমান আছে, তা আবার নতুন করে রচনা করতে হবে কেন? আমাদের সামনে আছে ইসলাম, যাতে প্রয়োজনীয় সব নিয়মকানুন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখার মতো অতি জরুরি আরেকটি বিষয় হলো, কার রচিত নিয়মকানুনে সফলতা আসতে পারে? অসীম জ্ঞানের অধিকারী মানবজাতির, নাকি অসীম জ্ঞানের অধিকারী মানবস্রষ্টার? কাজেই একমাত্র ইসলামি শরিয়তের দেওয়া নিয়মকানুনই হলো অনুসরণীয়।

দাম্পত্য জীবনকে সুখময় ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শরিয়তবর্ণিত নিয়মকানুন উপস্থাপন করে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ওই ধারাবাহিকতারই একটি উত্তম অংশ। এতে দাম্পত্য জীবনে সুখী মানব হওয়ার জন্য মানবস্রষ্টা রচিত নিয়মকানুন সুন্দর উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে লেখক, বলা যায়, সবগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের সমাহার ঘটিয়ে ফেলেছেন। এটা তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকা পুস্তকটি পাঠে অনেক উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদক
২৩.০৭.২০২০ ইং.

ভূমিকা

রব্বুল আলামিন আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, তাঁর শোকরগুজার ও জিকির কারী বান্দাদের প্রশংসা, আমাদের ওপর আল্লাহর যত নেয়ামত আছে, তৎসমুদয় নেয়ামতের প্রশংসা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবিগণের ওপর।

পর সমাচার এই যে, দাম্পত্য জীবন, দম্পতির পারস্পরিক অধিকার ও তাদের পারস্পরিক আচরণবিধি এমন একটি বিষয়, যা সম্পর্কে বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণকারী বা বিবাহিত কোনো মুসলিমের অজ্ঞ ও অনবগত থাকা উচিত নয়। কেন? কারণ, স্থায়ী ও সৌভাগ্যমণ্ডিত দাম্পত্য জীবন কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার অনুসরণ ব্যতীত গঠন করা সম্ভব নয়। তাই আমি সংক্ষিপ্ত কলেবরে একটি পকেট পুস্তিকা রচনা করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম, 'তাওজীহাতুন হাম্মাতুন ফিলমুয়াশারাতিয যাওজিয়্যাতি ওয়াহুকূকিয যাওজাইন'। এটি প্রকাশিত হয়েছে আল মাকতাবাতুল মাহমুদিয়া থেকে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ কর্তৃক তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাই প্রকাশক চেয়েছেন, পুস্তিকাটি আরও বড় কলেবরে বিস্তারিত আলোচনাসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হোক। এতেই আত্মপ্রকাশ ঘটল বক্ষ্যমাণ পুস্তকের। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা এবং তাঁরই পক্ষ হতে আসে সকল দান।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন এই মেহনতটুকু কবুল করে নেন এবং আমাকে উত্তম নসিহত ও অত্যাবশ্যক দিকনির্দেশনা উপস্থাপনের মাধ্যমে দম্পতিদের দাম্পত্য জীবনকে স্থায়িত্ব প্রদানে ভূমিকা রাখার তাওফিক দান করেন।

আল্লাহই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার মালিক এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। সকল প্রশংসা রব্বুল আলামিন আল্লাহর জন্য।

লেখক

ক্ষমাশীলের ক্ষমার মুখাপেক্ষী
সাইয়েদ মুবারক আবু হেলাল
২৬ জুমাদাল উলা ১৪২২ হি.
১৬ আগস্ট ২০০১ ই.

চতুর্থ অধ্যায়

বিবাহ মানবজাতির স্বভাবসুলভ বিষয়
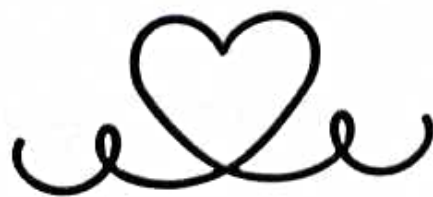
বিবাহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির মধ্য হতে একটি নিদর্শন। একে তিনি মানুষের স্বভাবগত বিষয় করে দিয়েছেন। যখন তিনি আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর জন্য তিনি হাওয়া (আ.)-কেও সৃষ্টি করেছিলেন। যাতে হাওয়া (আ.) আদম (আ.)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেন এবং তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী হতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

মানুষের মধ্যে যত চাহিদা ক্রিয়াশীল, তার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক হলো তার জৈবিক চাহিদা। এই চাহিদা চরিতার্থকরণের জন্য আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত একমাত্র ব্যবস্থা হলো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এ ব্যবস্থাটিই মানবজাতিকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে থাকে। আপনি কখনো কোনো বুদ্ধিমান পুরুষকে অন্তর থেকে এ কথা বলতে শোনবেন না যে, 'আমার বিবাহের ইচ্ছে নেই'। আর এমন কোনো নারীও আপনি পাবেন না, যে তার অন্তরে এমন একটি ঘরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, যা তাকে এমন এক স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থানের সুযোগ এনে দেবে, যে তার অধিকার সম্পর্কে হবে সচেতন, এনে দেবে এমন সন্তানাদির পরশ, যাদের মাধ্যমে সে অর্জন করবে তার মাতৃত্ব ও মর্যাদার অনভূতি। নর হোক কিংবা নারী, আপনি এমন কোনো সুবোধ ব্যক্তি পাবেন না, যে বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করে। তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা।

হ্যাঁ, যদি আপনি শুনতে পান, এক ব্যক্তি দাবি করছে সে বিবাহ করতে চায় না, তাহলে বুঝে নিন তার উদ্দেশ্য কেবল প্রবৃত্তিপূজা এবং তার এই দাবি মিথ্যা যে, বিবাহের কোনো প্রয়োজন তার নেই এবং নিজের বিপথগামী হওয়ার ও ভ্রান্তিতে

নিপতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা সে বোধ করে না। নিশ্চিত জানুন, সে হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। কারণ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানবজাতির এমন একটি চরিত্র, যা থেকে মানব কেবল বিশেষ কোনো কারণেই বিরত থাকতে পারে। যেমন : এমন কোনো ব্যাধি, যা দাম্পত্য জীবনাচার বাধাগ্রস্ত করে বা দাম্পত্য জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদের অভাব।

নর সম্পর্কে আমি যা বলছি, নারীর বেলায়ও তা প্রযোজ্য। বিবাহ ব্যতীত নর যেমন তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও হারাম থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং নারীর সঙ্গ ব্যতীত জীবনধারণ করতে পারে না; তেমনি নারীও এমন নরের সঙ্গ ব্যতীত জীবনধারণ করতে পারে না যার মাধ্যমে সে দয়া, শান্তি ও ভালোবাসার পরশ পাবে।

সারকথা, নর ও নারী পরস্পরের মুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তিই এর বিপরীত দাবি করবে, সে আসলে তার নিজ চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।” (সুরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

সহিহ হাদিসে আছে, হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, ‘একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরে তিন ব্যক্তি এলেন। তাঁরা এসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের এ সম্পর্কে জানানো হলে তাঁদের কাছে যেন তা কম মনে হলো। তাঁরা বললেন, ‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়, আর আমরা কোথায়? আল্লাহ তো তাঁর পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।’

তাঁদের একজন বললেন, 'আমি সর্বদা নামাজে রাত কাটাব।'

অন্য একজন বললেন, 'আমি একনাগাড়ে রোজা রাখব।'

তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারীদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করব এবং কখনো বিবাহ করব না।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন।

তিনি কী বললেন?

তিনি কি বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের বরকতে ভূষিত করুন। তোমরা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি?' তিনি কি বলেছেন, 'তোমরা তাকওয়ার ওপর আছো?'

তিনি কি সাহাবিদের তাঁদের অনুসরণ করতে বলেছেন?

কিছুতেই নয়! নবির জন্য কিছুতেই সম্ভব নয় সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর প্রদত্ত স্বভাব ও প্রকৃতির বিরোধিতা করা। এ তো তিনি স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন, এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যার অন্তর চায় ইসলামের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বন করতে, মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করতে। অথচ সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক অবগত।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এমন বিষয়ের কথা বলতে দেখলেন, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দিলেন সত্যের দিকে। তিনি তাঁদের ও যারা তাঁদের চিন্তাধারা ও চরমপন্থার অনুসারী তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরাই কি এই এই কথা বলেছ?... শুনে রাখো, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী এবং সবচেয়ে অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী। তবু আমি রোজা রাখি, আবার রোজা ছাড়ি; নামাজ পড়ি, আবার ঘুমাই এবং নারীদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। যে আমার পথ হতে বিমুখ হবে, সে আমার কেউ নয়।"[১]

এভাবে, হে প্রিয় পাঠক, যে ব্যক্তি অবিবাহিত থাকতে চায়, সে যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে,

---

১. বুখারী, মুসলিম

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান বিন মাজউন (রাযি.)-কে অবিবাহিত থাকতে নিষেধ করেছিলেন। যদি তিনি তাঁকে এর অনুমতি প্রদান করতেন, তাহলে আমরা খাসি হয়ে যেতাম।'[১]

অর্থাৎ যদি তিনি অবিবাহিত থাকার অনুমতি প্রদান করতেন এবং ফলে আমাদের খাসি হতে হতো, তাহলেও আমরা তা-ই করতাম।

বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা আয়িয়ম (বিবাহহীন) তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা নুর, ২৪ : ৩২)

আয়াতের الْأَيَامٰى -শব্দটি أَيِّمٌ-শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো স্ত্রীহীন পুরুষ বা স্বামীহীনা নারী।

সহিহ হাদিসে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে যুবসমাজ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে নেয়; আর যারা সামর্থ্য রাখে না, তারা যেন রোজা রাখে। কারণ, এটি তাদের জন্য জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের উপায়।'[২]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহযাপনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উপস্থিত করার সামর্থ্যরে কারণে সহযাপন করতে সক্ষম হবে, সে যেন বিবাহ করে; আর যে ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহযাপনের

১. বুখারী
২. বুখারী, মুসলিম

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উপস্থিত করার সামর্থ্য না থাকার কারণে সহযাপন করতে সক্ষম হবে না, সে যেন রোজা রাখে। যাতে সে তার জৈবিক চাহিদা দমন করতে এবং বীর্যের অনিষ্ট প্রতিরোধ করতে পারে, যেভাবে খাসি হওয়া তা প্রতিরোধ করে।'

বিবাহ করার ক্ষমতা থাকলে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত এই উপদেশটি কতই-না গুরুত্বপূর্ণ! কারণ, তাতে ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সংগতির অভাব বা অন্য কোনো কারণে যদি কারও পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে এই নববি চিকিৎসা, যার মাধ্যমে সে তার কামনাকে হ্রাস করতে পারে। আর সেটা হলো রোজা।[১]

কিন্তু, কী হালো ইন্টারনেট-যুগের যুবসম্প্রদায়ের, যারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না (তবে যাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন ভিন্ন কথা)! না সে বিবাহের এই হালাল উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তার জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করতে সক্ষম, আর না সে রোজা রাখতে সক্ষম। ফলে কী হয়? প্রচণ্ড জৈবিক চাহিদা, ভয়ানক অবক্ষয়, অবাধ পাপাচার, আর খুন করে বা গোপনে কিংবা প্রচলিত রীতিতে কৃত বিবাহ-যাতে না থাকে কোনো অভিভাবক, না থাকে কোনো সাক্ষ্য, আর না থাকে প্রচার। এ তো বিবাহ নয়; ব্যভিচার ও বন্ধুত্ব পাতানো। এটা করা হয় বিভিন্ন শিরোনামে। যেমন : প্রেম ও ভালোবাসা, স্বাধীন বন্ধুত্ব। যুবক-যুবতিরা পরস্পর একান্তে মিলিত হয়। শয়তান তাদের দিলে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং এভাবে তাদের মাধ্যমে নিজ

---

১. স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত। কিন্তু অবস্থাভেদে কারও জন্য তা ফরজ-ওয়াজিব, আবার কারও জন্য মাকরূহ, এমনকি হারামও হতে পারে।

এবার ব্যাখ্যায় আসা যাক। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবেই জৈবিক চাহিদা দান করেছেন। এই চাহিদার তাড়না মানুষকে তিনটি হারাম কাজে নিপতিত করতে পারে : (১) যিনা, (২) কুদৃষ্টি, (৩) হস্তমৈথুন। তাই এই চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্যও শরিয়তে তিনটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে : প্রথমত, সম্ভব হলে বিবাহ করা; দ্বিতীয়ত, সম্ভব হলে বাঁদি রাখা; তৃতীয়ত, প্রথম দুটি সম্ভব না হলে রোজা রাখার মাধ্যমে নিজেকে সংযত রাখা। কিন্তু যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম নয়-আর বাঁদি রাখা তো বর্তমানে সম্ভব নয়-তার জন্য বিবাহ করাই নির্ধারিত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি জৈবিক চাহিদার তাড়নায় উল্লেখিত তিনটি হারাম কাজের যেকোনোটিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যার ক্ষেত্রে শুধু আশঙ্কা নয়; বরং সুনিশ্চিতই সে গুনাহগুলোতে লিপ্ত হচ্ছে বা হবে বলে ধারণা হয়, তার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ফরজ। তবে বিবাহ ওয়াজিব ও ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তদ্বয় প্রযোজ্য : এক. স্ত্রীকে মহর, ভরণ-পোষণ ও আবাস দেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। দুই. বিবাহের পর স্ত্রীর হক আদায় করার সক্ষমতা থাকতে হবে এবং পরিবার কর্তৃক জুলুম না হওয়ার পরিস্থিতি থাকতে হবে। অতএব, বিবাহের পর স্ত্রী নির্যাতিত হওয়া সুনিশ্চিত বলে মনে হলে বিবাহ করা হারাম হবে। আর নির্যাতনের প্রবল আশঙ্কা হলে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর জুলুমের ক্ষীণ আশঙ্কা হলে কোনো সমস্যা নেই, বিবাহ করা বৈধ থাকবে। [সম্পাদক]

বাসনা বাস্তবায়ন করে নেয়। এভাবে তারা হচ্ছে লাঞ্ছিত। যুবতিরা হচ্ছে ধর্ষিতা। হারামের মাধ্যমে তাদের গর্ভ হচ্ছে স্ফীত। দেখা দিচ্ছে অবক্ষয় ও বিপর্যয়। এ অবস্থা থেকে তাদের আল্লাহ ছাড়া আর কে বাঁচাতে পারে? তিনিই পরম উত্তম অভিভাবক।

এসব কারণেই আমরা যুবসমাজকে বিবাহের ক্ষমতা থাকলে বিবাহবিমুখ হতে নিরুৎসাহিত করি এবং ক্ষমতা না থাকলে রোজা রাখতে উৎসাহিত করি। মহর-উপঢৌকন ও আনন্দ-উল্লাসের ছুতায় সামাজিক কুপ্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করতেও আমরা নিরুৎসাহিত করি। অভিভাবকদের আমরা বলি, বিবাহব্যয়ে অতিরঞ্জন বিবাহকে অধিকতর কষ্টসাধ্য করে তোলে। আপনারা যদি হালালকে কঠিন করে দেন, তাহলে হারাম ব্যাপক হয়ে যাবে। আপনারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী স্মরণ করুন, 'সবচেয়ে অধিক বরকত ওই বিবাহে হয়, যার ব্যয় কম হয়।'[১] আর অভিভাবকদের প্রতি আমার উপদেশ, আপনারা আমার 'আশ-শাবাবু ইলা আইন' (যুবসমাজ কোন পথে) শীর্ষক বইটি পাঠ করুন। তাহলে যুবসমাজের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। একমাত্র আল্লাহরই কাছে বান্দা পারে সাহায্য চাইতে।

বিবাহ সামাজিক প্রয়োজন

বিবাহ কেন সামাজিক প্রয়োজন? কারণ, তা সমাজে স্থিরতা ও শৃঙ্খলা আনে এবং সমাজের সদস্যদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা হতে দূরে রাখে। ফলে এইডস প্রভৃতি ব্যাধির মাধ্যমে সমাজ কলঙ্কিত হয় না।

তা ছাড়া এটা মানুষের জৈবিক চাহিদাকে হালাল উপায়ে পূরণ করে। শুধু তাই নয়, বিবাহে আছে দম্পতির পরস্পরের মধ্যে দয়ামায়া ও প্রীতি-ভালোবাসার বিকাশ।

বান্দার প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তাআলা যেসব উপকরণকে হালাল করেছেন, সেগুলোর মধ্যে বিবাহ একটি উত্তম উপকরণ। এ উপকরণকে অবলম্বন করে বংশবিস্তার ও মানবগোষ্ঠীর সংরক্ষণে ভ,মিকা রাখতে মানুষ লজ্জারও শিকার হয় না।

বিবাহের আরও উপকারিতা আছে। এটি দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে নর ও নারীর অন্তরে সুপ্ত পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের বাসনাকে বাস্তবায়িত করে এবং পরিবারসমূহের

১. হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে এটি ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন।

মধ্যকার বন্ধনকে দৃঢ় করে।

হে আমার মুসলিম ভাই ও বোন

বিবাহ মানে কেবল নর ও নারীর জাতিগত ও দৈহিক সম্পর্কই নয়। এটি একটি বীজ, যা থেকে অঙ্কুরিত হয় পরিবার; আর এই পরিবারই হলো শান্তি, নিরাপত্তা ও ঈমানের সুবাসে সুবাসিত একটি নিখুঁত ও সুগঠিত সমাজের ভিত্তি। এটি তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রতিটি সদস্য ইসলাম ও স্বদেশের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ থাকবে।

স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন : বিবাহের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্তর

আমার মতে, বিবাহ-প্রক্রিয়ার অর্ধেকই হলো বর ও কনে নির্বাচন। আর এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নর ও নারী উভয়কে সুন্দর নির্বাচনে উৎসাহিত করেছেন। এই নিন কিছু নববি নসিহত। এগুলো তাদের জন্য, যারা বিবাহে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের প্রত্যাশা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সওয়াবের ভাগী হওয়ার আশা রাখে। আল্লাহই সাহায্য করার মালিক।

স্ত্রী নির্বাচন[১]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চারটি জিনিস দেখে নারীকে বিবাহ করা হয় : রূপ, বংশ, সম্পদ, ধার্মিকতা। ধার্মিকতার অধিকারিণীকে নিয়ে তুমি ধন্য হও।'[২]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'দুনিয়া হলো ভোগসামগ্রী। আর সমস্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে উত্তম হলো ধার্মিকা নারী।'[৩]

হ্যাঁ, হে যুবক, দীনকে তুমি তোমার লক্ষ্য স্থির করো। শুধু রূপের পেছনে পোড়ো না।

---

১. আল্লামা ইবনে আবিদীন রহ. তাঁর রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে লেখেন, 'স্ত্রী বয়স, সম্রান্ততা, সম্মান ও সম্পদের দিক থেকে স্বামী থেকে কম হওয়া চাই। কিন্তু চরিত্র-মাধুর্য, শিষ্টাচার, খোদাভীরুতা ও রূপ-লাবণ্যে স্বামী থেকে বেশি হওয়া চাই।' [সম্পাদক]

২. সহিহুল বুখারী, সহিহু মুসলিম

৩. সহিহু মুসলিম, সহিহুন নাসাই, সহিহু ইবনে মাজাহ

বংশকৌলীন্য ও নারী উন্নয়ন আন্দোলন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। এর চাকচিক্য ও নগ্নতা এবং বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে এর অশ্লীল মেলামেশার প্রতি তুমি ভ্রুক্ষেপ কোরো না। সেখানে চলে মৃদু হাসি ও অট্টহাসি। ফলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে কুবাসনায় লিপ্ত হয়।

শীঘ্রই এই নারী তোমাকে দাইয়ুস বানিয়ে ছাড়বে, যদি তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার কাজেকর্মে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। দাইয়ুস হলো সে, যার মধ্যে আপন স্ত্রীর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করে না।

নারীর সম্পদও যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। কারণ, সম্পদ হলো ক্ষণিকের ছায়া। সঠিক উপায়ে কাজে লাগানো না হলে তা মালিকের জন্য বিপদ ডেকে আনে। সম্পদের অধিকারী যে হয়-তাকে প্রতারিত করে সম্পদের লোভ, আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য প্রদান, শয়তানের অনুসরণ, রহমানের বিরুদ্ধাচরণ। নাউযু বিল্লাহ!

আপনি একজন নারী নির্বাচন করছেন-তার অর্থ হলো, আপনি আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রী নির্বাচন করছেন এবং আপনার সন্তানদের মা নির্বাচন করছেন। কাজেই এই নির্বাচনের ভিত্তি হওয়া চাই দীন।... তাকে হতে হবে পর্দানশিন, ঘরে অবস্থানকারিণী। অন্তরে সে লালন করবে এমন দাম্পত্য জীবনের প্রত্যাশা, যাতে থাকবে স্থায়িত্ব ও স্থিরতা এবং যার ভিত্তি হবে একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার ওপর এবং দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালোবাসার ওপর। তাকে এমন হতে হবে, নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের স্লোগান তাকে প্রভাবিত করেনি। সম্পদ, প্রসিদ্ধি ও বংশমর্যাদার কারণে সে স্বামীর ওপর অহংকার প্রদর্শন করে না।

স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুরুষকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব উপদেশ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, স্ত্রী যেন কুমারী হয়।

কেন?

কারণ, কুমারীর মধ্যে বিবাহের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে না। বিবাহ তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ফলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় নিবিড় ও গভীর। কবি বলেন,

'প্রীতি তো পায় প্রথম প্রীতিভাজন।'

হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, 'আমার বিবাহের পর বেশি দিন বিগত হয়নি, একদিন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'কুমারী, না বিধবা?' বললাম, 'বিধবা।' বললেন, 'কুমারী কেন বিবাহ করলে না? সে তোমার সঙ্গে খেলা করত, তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে?"[১]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি উপদেশ হলো, পুরুষ যেন অধিক সন্তান প্রসবকারিণীকে বিবাহ করে। নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে নিশ্চিত হতে হবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা প্রেমময়ী (اَلْوَدُوْدُ) ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণীকে বিবাহ করো। কারণ, কিয়ামতের দিন আমি অপরাপর উম্মতের সামনে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব।'[২]

اَلْوَدُوْدُ হলো এমন নারী, যে স্বামীর ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করে, তাকে ভালোবাসে এবং সন্তুষ্ট রাখে।

স্বামী নির্বাচন

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন পুরুষকে বলেছেন ধার্মিকতার ভিত্তিতে স্ত্রী নির্বাচন করতে, তেমনি তিনি নারীকেও বলেছেন ধার্মিকতা ও সচ্চরিত্রের ভিত্তিতে স্বামী নির্বাচন করতে। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।'[৩] তিনি আরও বলেন, 'যখন তোমাদের কাছে এমন কেউ আসবে, যার আমল-আখলাক তোমাদের ভালো লাগে, তখন তাকে বিবাহ করিয়ে দেবে। যদি তোমরা এটা না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা ও ব্যাপক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে।'[৪]

প্রিয় বোন

জেনে রাখো, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ আবার তার রবকেও চেনে, সে-ই তোমার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত। তারপর হলো তোমার হবু স্বামীর অন্যান্য গুণ। যেমন :

১. বুখারী, মুসলিম
২. আবু দাউদ, নাসাই, হাকেম। হাকেম বলেন, 'এর সনদ সহিহ।'
৩. বুখারী, মুসলিম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণিত।
৪. তিরমিযি, হাকেম। এর সনদ সহিহ।

সৌন্দর্য, সম্পদশালিতা ও বংশকৌলীন্যের পালা।

জেনে রাখো, তোমার ধর্ম তোমাকে স্বামী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। তোমার অপছন্দের কারও সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার তোমার অভিভাবকের নেই। তুমি তোমার এ অধিকারের সদ্ব্যবহার করো এবং এমন কাউকে নির্বাচন করো, যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে তোমার সহযোগী হবে। হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.) ওই ব্যক্তিকে কী সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন, যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার একটি মেয়ে আছে। তাকে কার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া আপনি ভালো মনে করেন?' তিনি বলেছিলেন, 'তাকে এমন কারও সঙ্গে বিবাহ দিন, যে আল্লাহকে ভয় করে। যদি আপনার মেয়েকে তার ভালো লাগে, তাহলে সে তাকে সম্মান করবে; আর যদি ভালো না লাগে, তাহলে অন্তত জুলুম করবে না।'

বাসররাতের আদব-কায়দা

সুন্নত হলো, বর যখন কনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে তখন কনের মাথার সম্মুখভাগের চুল ধরবে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এ দোয়া পড়বে[১] :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

তারপর আল্লাহর শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে সে কনেকে নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে এবং খাবার খাবে।

সুন্নত হলো, কনে কুমারী হলে তার সঙ্গে সাত দিন অবস্থান করা, আর বিধবা হলে তিন দিন অবস্থান করা। এটা যেন তাকে (বর হওয়ার ছুতায়) জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কারণ এ কথা এমন কোনো মুসলিম বলতে পারে না, যে নাকি মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের সওয়াবের আধিক্য সম্পর্কে ধারণা রাখে।

১. মুসলিম

বাসররাতে বর ও কনে পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ আচরণের প্রকাশ ঘটায়। আমরা প্রথমে তাদের পারস্পরিক অধিকার বর্ণনা করব। তারপর পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের জন্য অপরজনের প্রতি কী আচরণ প্রদর্শন আবশ্যক, তার সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করব। আল্লাহই সাহায্যকর্তা।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর ওপর স্ত্রীর ওয়াজিব অধিকার রয়েছে। এগুলো আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। তবে স্ত্রী অবাধ্য হলে সে অবস্থার হুকুম ভিন্ন। এ সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীর কিছু অধিকার এখানে আলোচনা করা হলো :

১. ন্যায়পন্থায় তার দেখাশোনা করা

স্ত্রীর প্রয়োজনাদি যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা স্বামীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। আর এটা করতে হবে সাধ্যমতো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি।" (সূরা তালাক, ৬৫ : ৭)

তিনি আরও বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

"পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে।" (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর প্রয়োজনে ব্যয় করার ব্যাপারে স্বামীকে দায়িত্বশীল করেছেন। কারণ, স্বামীকে তিনি দিয়েছেন পুরুষসুলভ গুণাবলি, ধৈর্য ও শক্তি-সামর্থ্য। স্ত্রীকেও তিনি করেছেন দায়িত্বশীল-স্বামীর সন্তানাদির দেখাশোনা ও লালনপালনের ব্যাপারে, তাদের আদব-কায়দা ও আচার-সংস্কৃতি শিক্ষাদানের ব্যাপারে, স্বামীর ঘরের কাজকর্মের ব্যাপারে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে

স্বভাবপ্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (যেমন : নারীত্ব, দুর্বলতা, ধৈর্য ও মমতা) এগুলোর মাধ্যমে স্বামীকে সুখ ও আনন্দ দানের ব্যাপারে। অতএব, নর ও নারী উভয়েরই রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। নরের যা দায়িত্ব, তা করার সামর্থ্য নারীর নেই। আবার নারীর যা দায়িত্ব, তা সম্পাদনের ক্ষমতাও নরের নেই।

কিন্তু মানবিক স্বভাবপ্রকৃতির রীতিনীতি থেকে যারা বিচ্যুত, দৃষ্টি ও বোধশক্তির অন্ধত্ব যাদের আক্রান্ত করেছে, তারা নারী স্বাধীনতা ও নরের সঙ্গে তার সমতার দাবি করে। কোন সমতার দাবি তারা উত্থাপন করে? জানি না। আমরা নারীকে দেখি পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে, ফুটবল খেলা ও কুস্তি ইত্যাদি চর্চা করতে, পুরুষের কাজে নির্লজ্জভাবে অংশগ্রহণ করতে, রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে তার সঙ্গে মিলেমিশে চলাফেরা করতে। এভাবে সে সমাজটা কলুষিত করার পেছনে ভ‚মিকা রাখে। সাজসজ্জা, সৌন্দর্য প্রদর্শন, নরের সঙ্গে একান্তে মিলন ও কণ্ঠস্বরের কোমলকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে গতানুগতিকতার অনুসরণ করে সে সমাজে অশ্লীলতা ও অশালীনতার বিস্তার ঘটায়।

জানি না, কেন সে এগুলো করে।

পুরুষকে আকৃষ্ট করে বিবাহে প্রবৃত্ত করার জন্য?

নাকি সমতা ও প্রতিযোগিতার অনুরাগে?

নাকি ছলনার মাধ্যমে পুরুষকে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে ধ্বংস করার জন্য?

ইসলাম তো নারীকে দিয়েছে সম্মান এবং কষ্ট থেকে পরিত্রাণ, নারীর ব্যয়ের ভার পুরুষের ওপর অর্পণের মাধ্যমে। তাহলে কেন এ ঔদ্ধত্য, কেন এ অবাধ্যতা, কেন এ অকৃতজ্ঞতা?

পরিবারের জন্য ব্যয় করলে পুরুষও পাবে সওয়াব। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করলে এ সওয়াব কিছুতেই নষ্ট হবে না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পুরুষ যদি সওয়াবের আশায় পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তাহলে সে সদকার সওয়াব পাবে।'[১]

তিনি আরও বলেন, 'তুমি এক দিনার আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, এক দিনার

১. বুখারী, মুসলিম। আবু সাইদ বদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

গোলাম আজাদ করার জন্য ব্যয় করেছ, এক দিনার ফকিরকে দান করেছ এবং এক দিনার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ। এই সবগুলোর মধ্যে পরিবারের জন্য যেটি ব্যয় করেছ, তার সওয়াবই সবচেয়ে বড়।'[১]

২. স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা প্রদান

স্ত্রী যদি ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তাহলে তাকে ধর্মশিক্ষা প্রদান পুরুষের দায়িত্ব। কারণ, ঘরের কাজের সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা এবং সন্তানাদির দেখাশোনা ও লালনপালন তাকে মসজিদে যাওয়া, জুমা ও জামাতে শরিক হওয়া[২] এবং আলেমদের ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করার সুযোগ দেয় না। তা ছাড়া তাকে মসজিদে যেতে উৎসাহিত করা

---

১. মুসলিম, আহমাদ। আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

২. বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া মোটেও সমীচীন নয়। প্রশ্ন হতে পারে নবিজির যুগে তো মহিলারা মসজিদে যেত, তাহলে আমাদের জন্য বাধা কোথায়? এর উত্তর হিসেবে আমি পাঁচটি কথা বলব :
এক. তখন খাইরুল কুরুন তথা সর্বোত্তম যুগ হওয়ায় ফেতনার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে তাগিদ দেননি; বরং ঘর থেকে বের হতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

আবু দাউদ শরীফে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাযি.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'মহিলাদের ঘরের অন্দরমহলে সালাত আদায় করা অন্য স্থানে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।' (হাদিস নং : ৫৭১)

ত্বাবারানী শরীফে এসেছে, 'মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম।' (হাদিস নং : ১২৪)

দুই. নবিজির যুগে তাঁকে দর্শন শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ছিল। ঈমানের সাথে স্বচক্ষে দেখা ব্যতীত কেউ সাহাবির মর্যাদা অর্জন করতে পারত না। বর্তমানে এমন কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

তিন. নবিজির হাদিস হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। নবিজির মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাজকর্ম অন্যদের কাছে বর্ণনার দ্বারা এসব হাদিসের সংরক্ষণ হয়েছিল। তাই সে যুগে মহিলাদের নবিজির মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

চার. সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বর্তমান যুগটা ফেতনার যুগ। নবিজির সোনালি যুগের সাথে এ যুগের তুলনা দেওয়া কিছুতেই চলে না। বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মহিলাদের বর্তমান অবস্থা দেখতেন, তাহলে অবশ্যই মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করতেন, যেমন বনি ইসরাঈলের মহিলাদের বারণ করা হয়েছিল।' (হাদিস নং : ৮৬৯)

বুখারীর এ রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জুমাসহ অন্যান্য নামাজের জন্য কিংবা নসিহত শ্রবণ করার জন্য মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। কেননা, আয়েশা (রাযি.)- এর যুগ (মৃত্যু ৫৭ হি.) আমাদের বর্তমান সময় থেকে হাজারো গুণ নিরাপদ ছিল। এতৎসত্ত্বেও তাঁর এমন উক্তির পর কারও সংশয় থাকতে পারে না।

পাঁচ. এ ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পূর্ণ নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলেছেন। বুখারী শরীফের ৮৪১ নং হাদিসে আছে, সালাম ফেরানো মাত্রই মহিলারা তাদের ঘরে চলে যেত। অতঃপর পুরুষরা তাদের স্থান থেকে উঠত। এমনটা বর্তমান যুগে কল্পনাও করা যায় না; বরং যুবকরা নামাজ না পড়ে আগে থেকেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নামাজ না পড়ে রাস্তায় ঘুরাঘুরি করা প্রকাশ্যে মুনাফিকদের ক্ষেত্রেও কল্পনা করা যেত না। [সম্পাদক]

হলেও তা তার ওপর ওয়াজিব নয়। ঘরে নামাজ আদায় করাই তার জন্য সর্বোত্তম ও পর্দাপালনের জন্য অধিক সহায়ক।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। অবশ্য ঘরে নামাজ আদায় করাই তাদের জন্য উত্তম।'[১]

অতএব স্ত্রীকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় প্রকার শিক্ষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত করা স্বামীর জন্য অবশ্যকর্তব্য।

কিন্তু যদি স্বামীই হয় অজ্ঞ? জুমা ও জামাতেও যদি সে শরিক না হয়? চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়াই যদি হয় তার স্বভাব? মসজিদে যাওয়া ও আলেম-উলামার কাঁধে কাঁধ মেলানোর মানুষ যদি সে না হয়?

এমন ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো, স্ত্রীর ঘরের কাজে সহযোগিতা করে তাকে সুযোগ করে দেওয়া, যাতে সে মসজিদে গিয়ে ধর্মশিক্ষা লাভ করতে পারে।[২] এটা তাদের উভয়ের জন্যই উত্তম। কিন্তু স্ত্রীও যদি ধর্মশিক্ষা লাভে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তো সর্বনাশ!

স্বামী যদি স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে মূর্খতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে নিজেকেই ভীষণ বিপদে নিপতিত করবে। আমি কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

স্ত্রী যদি হয় শয়তান ও তার দোসরদের উপহাসের পাত্রী, মাথা ও পায়ের গোছা অনাবৃত করে, সাজসজ্জা করে, সুগন্ধি ব্যবহার করে। যদি সে ঘর থেকে বের হয়, আর এগুলো সে করে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে, তাহলে এমন স্ত্রীকে এভাবে চলার সুযোগ প্রদানকারী স্বামী কি জানে যে, এমন স্বামী দাইয়ুস[৩] সাব্যস্ত হয়? সে কি জানে যে, এমন স্ত্রী যদি তওবা করে পর্দাপালনের দিকে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন জাহান্নামের সুসংবাদ?

---

১. আবু দাউদ। এর সনদ সহিহ।
২. বর্তমান পরিস্থিতিতে ফুকাহায়ে কেরামের মতে মহিলাদের জন্য জুমা বা জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহে তাহরীমী। যার কারণ ব্যাখ্যাসহ খানিক আগে অতিবাহিত হয়েছে। [সম্পাদক]
৩. দাইয়ুস বলা হয় এমন পুরুষকে, যে অশ্লীলতা ও পাপকাজে নিজ পরিবার ও অধীনস্থদের বাধা দেয় না। ইবনে উমার (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না-পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারী এবং দাইয়ুস। [সম্পাদক]

স্ত্রী যদি এভাবে জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করে, তাহলে স্বামী জান্নাতের হুরদের বিবাহ করার আশা কী করে করতে পারে? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর সঙ্গে তার কতটুকু সম্পর্ক : 'দুই প্রকারের মানুষ জাহান্নামে যাবে। আমি তাদের দেখিনি। এক প্রকার হলো তারা, যাদের কাছে গাভির লেজের মতো চাবুক থাকবে। তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আরেক প্রকার হলো ওইসমস্ত নারী, যারা বস্ত্রাবৃতা হয়েও হবে অনাবৃতা, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। তাদের মাথার খোপা হবে বুখতি (মনিবের) উটের উঁচু কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুঘ্রাণও পাবে না; অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে।'[১]

স্ত্রীর চাইতে স্বামীই এই ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্য হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো জাহান্নাম থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। দেশনেতা তার প্রজাদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানাদির ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এভাবে তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[২]

স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, হায়েজ ও নেফাসের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অধিকাংশ নারীই অজ্ঞ। তারা এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী নানা কুপ্রথার অনুসরণ করে থাকে।

হায়েজের বিধান হলো, নারী এ সময় নামাজ ও রোজা আদায় থেকে বিরত থাকবে; কুরআন তিলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ থেকেও বিরত থাকবে। কিন্তু আপনি কিছু

১. মুসলিম। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।
২. বুখারী, মুসলিম। হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

নারীকে অজ্ঞতার কারণে এসব করতে দেখতে পাবেন। কিছু নারী এ সময় নামাজ বর্জন করে বটে, কিন্তু রোজা বর্জন করে না এবং ইফতারের পূর্বে এক ঢোক পানি পান করে নেয়। এগুলো অজ্ঞতা ও হারাম।

কিছু কিছু নারী বিশ্বাস করে, চোখ উঠেছে এমন কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলে প্রবেশকারী দৃষ্টিশক্তি হারাবে।

কিছু নারী তার নেফাসের সময়কাল চল্লিশ দিন ধরে নেয়। চল্লিশ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হলেও সে নামাজ, রোজা ও গোসল থেকে বিরত থাকে এবং স্বামীকে কাছে আসা থেকে বিরত রাখে। এসবও অজ্ঞতা ও হারাম।

হে স্বামী, তুমি তোমার স্ত্রীকে বলে দাও, নেফাসের সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরও যদি রক্ত জারি থাকে, তাহলে তাকে গোসল করে নামাজ ও রোজা আদায় শুরু করতে হবে। কারণ, চল্লিশ দিন পরের রক্ত নেফাসের রক্ত নয়; বরং অসুস্থতার রক্ত সাব্যস্ত হয়।

আর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে স্ত্রীর ওপর জরুরি হলো, সে অবিলম্বে গোসল করবে এবং নামাজ ও রোজা আদায় আরম্ভ করবে। এখন থেকে তুমিও তার কাছে যেতে পারবে। অতএব দেখার বিষয় হলো, রক্ত বন্ধ হয়েছে কি না। রক্ত বন্ধ না হলে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই হলো তোমার দায়িত্ব। তুমি কি এটা পালন করবে?

৩. স্ত্রীকে তার প্রার্থিত বস্তু দিয়ে খুশি করা, যদি না তা হারাম হয়

আদর্শ স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না, এতে তার যত কষ্টই হোক না কেন। তার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে তার স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।'[১]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজেই বকরির দুধ দোহন করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, নিজ কাপড় নিজেই সেলাই করতেন এবং স্ত্রীদের কাজেকর্মে

১. তিরমিযি। হাদিসটি সহিহ।

সহযোগিতা করতেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি ক্রীড়াকৌতুকেও লিপ্ত হতেন। তাঁর সম্পর্কে এটি প্রমাণিত আছে যে, তিনি হযরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। একদিন আয়েশা (রাযি.) আগে চলে গেলেন এবং অন্যদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে চলে গেলেন। তিনি বললেন, 'এটি ওই জয়ের বদলে।'[১]

মুসলিম স্বামী, যে কিনা তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায় তার জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, এতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি না করা। উদাহরণস্বরূপ, সে তাকে বাইরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে, যদি তাতে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার কিছু না থাকে। আবার থাকার ঘর ও পাকের ঘরের কাজেও সে তাকে সহযোগিতা করতে পারে, যদি তার উপস্থিতির মাধ্যমে স্ত্রীর আসলেই সহযোগিতা হয়। এ ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে ও নিশ্চিত হয়ে অগ্রসর হওয়া চাই, যাতে হিতে বিপরীত না হয়।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর কোনোটিই যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে সুন্দর কথা বলে বা তার রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো উপহার প্রদান করে কিংবা অন্য যেকোনোভাবে তাকে খুশি করতে সে যেন অবশ্যই চেষ্টা করে।

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ ও তার পক্ষ হতে প্রাপ্ত কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্যধারণ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তা-ই তোমরা অপছন্দ করছ।" (সুরা নিসা, ৪ : ১৯)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো। কারণ, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। এর সনদ সহিহ।

সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো তার ওপরের অংশ। তুমি যদি তা সোজা করার চেষ্টা করো, তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি চেষ্টা না করো, তাহলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো।'[১]

'আল-ফিকহুল ওয়াযেহ' গ্রন্থে এসেছে, 'নারীর আবেগ তাকে অনেক সময়ই এমন কাজ করতে বাধ্য করে, যা আসলেই নিন্দনীয়। তার সৃষ্টিগত স্বভাব ও সামাজিক অবস্থানের কারণে এবং তার ওপর অর্পিত দায়দায়িত্বের কারণে এমনটা হয়। আর নারী তার জীবনে হায়েজ, নেফাস, গর্ভধারণ ইত্যাদি যেসব কষ্টকর বিষয়ের সম্মুখীন হয়, পুরুষের উচিত হলো সেসবের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রেখে তার প্রতি দয়া ও স্নেহের অনুভূতি লালন করা। যাতে পারস্পরিক প্রীতি, করুণা ও ঘনিষ্ঠতা স্থায়ী হয় এবং জীবন হয় নির্মল হৃদ্যতায় সুখময়।'

যে স্বামী তার দাম্পত্য জীবনকে ফাটল ও ভাঙন থেকে মুক্ত রেখে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন করতে চায়, সে যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে কোনো দুর্ব্যবহারের শিকার হয় বা তার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় বা তার কোনো স্বভাব তার অপছন্দ হয়, তবু সে তাকে কোনোভাবেই কষ্ট দেয় না এবং তার ওপর কোনোপ্রকার জুলুম চাপায় না। স্বামী যদি প্রকৃতই স্ত্রীকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে ইচ্ছুক হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তির প্রত্যাশী হয়, তাহলে তার উচিত হবে স্ত্রীর পক্ষ হতে আগত এসব কষ্টের পেছনে ওজর খুঁজে বের করা। স্ত্রীর দোষত্রুটির দিকে যেভাবে স্বামী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তার উচিত সেভাবেই সে যেন তার উত্তম গুণাবলির প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীর প্রতি মনে বিদ্বেষ না রাখে। তার একটি স্বভাব ভালো না লাগলেও অন্যটি তো ভালো লাগবে।'[২]

সামান্য বিষয়েই উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা ও দাম্পত্য জীবনকে ভেঙে দেওয়া এবং যেসব ভুল কেবল লঘু শাসনের উপযুক্ত সে ধরনের কোনো ভুল করলেই তা ধরে বসা ও তার পেছনে কোনো ওজর তালাশ না করা, আমার ধারণায় এসব এমন স্বামীর কাজ, যে তার দাম্পত্য সম্পর্ককে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না এবং তাকে স্থায়ী করতে চায় না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর সঙ্গে তার কতটুকু সম্পর্ক : 'নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। সে কখনো

১. বুখারী, মুসলিম। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।
২. মুসলিম

তোমার জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। যদি তুমি তা থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তাকে বাঁকা থাকতে দিয়েই উপকৃত হতে হবে। তুমি যদি তা সোজা করার চেষ্টা করো, তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ হলো তালাক দেওয়া।'[১]

হে ওই স্বামী, যে দ্রুত চটে যাও। যার অনুভূতি ভোঁতা। যার মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে অকৃতজ্ঞতার। যার মনে দাম্পত্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভ‚তি নেই। স্ত্রীকে যে ক্ষমা করে না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দাবি করে, অথচ তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে না। তুমি কি জানো, হযরত আয়েশা (রাযি.) ছিলেন স্ত্রীদের মধ্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়? তথাপি তিনিও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কখনো কখনো অতিশয় রাগান্বিত হয়ে যেতেন, কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বলতেন, 'আমি কিন্তু তোমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বুঝতে পারি।' হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করতেন, 'কীভাবে বোঝেন?' তিনি বলতেন, 'তুমি সন্তুষ্ট থাকলে বলো, 'না, মুহাম্মাদের মাবুদের কসম!' আর অসন্তুষ্ট হলে বলো, 'না, ইবরাহীমের মাবুদের কসম!"[২]

আমি তোমাকে এ ছাড়া আর কী বলতে পারি যে, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তার সঙ্গে সদাচরণ করো, তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করো। একইভাবে স্ত্রীকেও আমি উপদেশ দিচ্ছি, সে যেন স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, স্বামীর অপছন্দের কোনো কিছু না করে এবং তাকে অসন্তুষ্ট না করে। আচরণে সৌন্দর্য আনয়ন উভয়েরই দায়িত্ব।

৫. তার মোহরানার অধিকার আদায় করা

স্ত্রীর এ অধিকার সম্পর্কে অনেক স্বামীই জেনেশুনে বা অজ্ঞতার কারণে উদাসীন থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

১. মুসলিম। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।
২. বুখারী, মুসলিম

"আর তোমরা নারীদের তাদের মোহরানা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। সন্তুষ্টচিত্তে তারা মোহরানার কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।" (সূরা নিসা, ৪ : ৪)

মোহরানা হচ্ছে নারীর একক অধিকার। অন্য কারও জন্য তাতে হস্তক্ষেপ জায়েজ নয়। তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতি ব্যতীত অন্য কারও জন্য তা নেওয়ার অনুমতি নেই। হ্যাঁ, চাপ প্রয়োগ, লজ্জা প্রদান বা প্রতারিতকরণ ব্যতীত তার সন্তুষ্টিসাপেক্ষে কিছু পাওয়া গেলে তা হালাল এবং তাতে গোনাহ হবে না।

স্ত্রী সম্মতি প্রদান করলে স্বামী পূর্ণ বা আংশিক মোহরানা বিলম্বিত করতে পারে। কিন্তু আদায়ের সময় নির্ধারণ করে নেবে। যদি সময় নির্ধারণ ব্যতিরেকে তার সঙ্গে সহযাপন করে, তাহলে তা স্বামীর জিম্মায় ঋণ সাব্যস্ত হবে এবং তা আদায় করা তার জন্য আবশ্যক হবে। এ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেলে তার মিরাস থেকে স্ত্রীর তা পাওয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহলে স্বামীর কাছ থেকে তা চেয়ে নেওয়ার অধিকার স্ত্রীর ওয়ারিশদের থাকবে। এটি এমন ঋণ, যা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। স্ত্রী মাফ করে দিলেও তার জিম্মা থেকে এটি সরতে পারে না।

অতএব স্বামীর প্রতি আমার উপদেশ হলো, মোহরানা আদায় করার ক্ষমতা না থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য স্ত্রীর ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করবে না। তাকে লজ্জিত বা প্রতারিত করবে না; বরং তাকে সন্তুষ্ট রেখে তার কাছে তা ক্ষমা করে দেওয়ার বিনীত আবেদন করবে। এ ক্ষেত্রে শেষ উপদেশ হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"আর কীরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যেখানে তোমরা একে অপরের সঙ্গে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?" (সূরা নিসা, ৪ : ২০-২১)

স্বামীর ওপর স্ত্রীর এই পাঁচটি অধিকারের আলোচনা করেই আমি এখানে ক্ষান্ত করলাম। এগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারসমূহ

স্বামীর ওপর যেভাবে স্ত্রীর অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীর ওপরও স্বামীর অধিকার আছে। এর কারণ বিশেষ করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অশেষ অবদান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি যদি কোনো মানুষকে অপর কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।'[১]

স্ত্রীর ওপর স্বামীর কিছু অধিকার উল্লেখ করা হলো :

১. স্বামীর আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তাতে আল্লাহর নাফরমানি হয়

আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ হালাল ও জায়েজ করেছেন, সেগুলোতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার। কারণ, এ আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে তার রবের সন্তুষ্টি। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, তার বিশেষ অঙ্গকে পাপাচার থেকে হেফাজত করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে তার রবের জান্নাতে দাখেল হবে।'[২]

আর জেনে রাখো, হে আমার মুসলিম বোন, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি ও আনুগত্য তোমার ওপর ওয়াজিব। তার অনুমতি না থাকলে তোমার জন্য কোনোপ্রকার নফল ইবাদত করা জায়েজ হবে না। যেমন : সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল রোজা রাখা বা রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা। এর দলিল হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য নফল রোজা রাখা জায়েজ নয়।'[৩]

তুমি কি বলছ, 'কেন?' উত্তর সোজা। অনেক সময় স্ত্রীর নফল ইবাদতের কারণে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ তুমি যদি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো বা দিনে সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবারের রোজা রাখো, তাহলে তা তোমাকে ক্লান্ত করতে পারে। সকল নারীর অবস্থা এক নয়। একজন নামাজ পড়ে ক্লান্ত হবে, আরেকজন রোজা রেখে ক্লান্ত হবে। আর এটা নিঃসন্দেহে স্বামীর পছন্দনীয় উপায়ে তার শরিয়তসম্মত

১. তিরমিযি, ইবনে মাজাহ। এর সনদ হাসান সহিহ।
২. ইবনে হিব্বান। সহিহুল জামে গ্রন্থে শায়খ আলবানি (রহ.) এ রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।
৩. বুখারী। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

অধিকার আদায়কে বাধাগ্রস্ত করবে। সে যদি তার মনোবাসনা হালাল উপায়ে পূরণ করতে না পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি এভাবে তাকে তার মনোবাসনা পূরণের জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বনের দিকে ঠেলে দিচ্ছ-হোক তা কেবল হারাম দৃষ্টি ও তার কুফল। এমতাবস্থায় হতে পারে, সে বড় কোনো ভুল করে বসবে বা আরেক স্ত্রী ঘরে আনবে। যা-ই হোক, এমন কিছু হলে তার জন্য তুমি কেবল নিজেকেই দায়ী কোরো।

ভালো করে মনে রেখো, শুধু নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে এই হুকুম। আর ফরজের হুকুম হলো, মহান সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করার অনুমতি নেই। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা।

আর জেনে রাখো, নফল ইবাদতের ওপর স্বামীর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রদর্শন করে যদি তুমি তার আনুগত্য বর্জন করো এবং সে তোমাকে বিছানায় আহবান করলে যদি তুমি কঠিন পীড়া বা হায়েজের মতো বাস্তব ওজর ছাড়াই কেবল কষ্ট ও ক্লান্তির অজুহাতে তার আহ্বানে সাড়া প্রদান না করো, তাহলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে : 'কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলে যদি সে সাড়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, তাহলে ফেরেশতারা ওই নারীকে সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।'[১]

২. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে অন্যকে প্রবেশে করতে না দেওয়া এবং তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়া

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ, অত্যাবশ্যক প্রয়োজন থাকলে এবং স্বামী সফর বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে ভিন্ন কথা।

যদি সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আপনজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও বের হয় এবং এ কারণে স্বামীর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কথা তার জানা থাকে, তাহলে সে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করল।

১. মুসলিম। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়! প্রগতিবাদের এই যুগে সমানাধিকারের প্রবক্তারা নারীকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার বিরোধিতায় অবতীর্ণ করেছে এবং এভাবে তারা স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই-না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক!

কেউ কেউ তো স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নারীর বাইরে ভ্রমণকে শুধু সমর্থন করেই ক্ষান্ত করে না; বরং একে নিষেধকারীদের বিরুদ্ধে রীতিমতো মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

এই নিষেধকে তারা মনে করে নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী। জানি না, কবে নারীরা তাদের অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করবে। বছরের পর বছর তারা স্লোগান তুলছে তথাকথিত এই স্বাধীনতার-কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে বের হওয়ার স্বাধীনতার। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন!

কী করে তারা এটাকে স্বাধীনতা (?) বলে দাবি করে!

তা ছাড়া স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর বাইরে গমনের সার্থকতা কী? কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ বলছেন, “কর্তৃত্ব পুরুষের। নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে বাধা দেওয়ার অধিকার তার আছে”, আর আপনারা বলছেন, ‘না, নারীর অধিকার আছে বাইরে যাওয়ার, ভ্রমণ করার ও যা ইচ্ছা করার।’

সহিহ হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমানধারিণী কোনো নারীর জন্য তার পিতা, ভাই, স্বামী, পুত্র বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে নেওয়া ব্যতীত তিন বা ততধিক দিনের জন্য সফর করা জায়েজ নেই।’[১]

কেন এ আদেশ? কারণ, নারী যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মারে এবং নারী যখন কোনো পুরুষের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।

এই হলো বাস্তবতা। তা সত্ত্বেও নারীকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বাইরে ও সভাসমিতিতে গমনে, অধ্যয়নের ছুতায় ভ্রমণে ও দূরদূরান্ত পর্যটনে—যার কুফল হলো স্বামীর অশান্তি ও ভোগান্তি।

---

১. মুসলিম

প্রিয় বোন

এ স্লোগান তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। যদি তুমি সত্যিকারেই অন্তরে ঈমান রাখো, তাহলে আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ রাখো :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬)

আর সাবধান! স্বামী অপছন্দ করে এমন কাউকে যেন তুমি তার ঘরে প্রবেশ না করাও। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী স্মরণ করো : 'স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো নারীর জন্য রোজা রাখার অনুমতি নেই। আর অনুমতি নেই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়ার।'[১]

আরও জেনে রাখো, স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষের অনুপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তিকে তোমার কাছে আসতে দেওয়া কিছুতেই জায়েজ নয়; বরং এটা হারাম। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.)-এর হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে হারাম আখ্যা দিয়েছেন। ওই হাদিসে তিনি বলেছেন, 'নারীদের কাছে যাওয়া থেকে তোমরা যেন দূরে থাকো।' এক আনসারি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, দেবরের (حَمْوٌ) কী হুকুম?' তিনি বললেন, 'দেবর তো মৃত্যুতুল্য।'[২]

حَمْوٌ হলো স্বামীর আপন বা চাচাতো ভাই। তাদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পরিবারের কারও বন্ধু বা প্রতিবেশী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

সাবধান! সাবধান! তোমাকে বিবাহ করা যাদের জন্য জায়েজ (যেমন : তোমার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, তোমার স্বামীর সহোদর, স্বামীর বন্ধু, প্রতিবেশী বা অন্য কেউ) তাদের কাউকে স্বামী বা অন্য কোনো মাহরামের অনুপস্থিতিতে নির্জনে

১. বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য
২. বুখারী, মুসলিম

তোমার ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া সম্পর্কে ভীষণ সাবধান! এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা।

তুমি যদি সতর্কতার সঙ্গে এসকল মানুষকে নির্জনে তোমার কাছে আসতে দেওয়া থেকে বিরত থাকো, কিন্তু তোমার স্বামী একে গুরুত্ব না দেয় এবং তার সহোদর বা বন্ধুদের তার অনুপস্থিতিতে তোমার কাছে আসতে না দেওয়ার কারণে তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। এবং এতে যদি তার ও তোমার আপনজন ধর্মীয় বিধিবিধান ও জায়েজ-নাজায়েজ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তোমাকে কষ্ট দেয়। অথবা তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। যেমন : বলে, 'এটা ঠিক নয়', 'এটা অন্যায়' ইত্যাদি, তাহলে জেনে রাখো, তুমি সত্যের ওপর আছো; আর তারা অসত্যের ওপর আছে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ এ গোমরাহ স্বামীর কঠিন হিসাব নেবেন, যে এমন কর্ম ও প্রথায় অভ্যস্ত, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

সুতরাং তোমার দায়িত্ব হলো, স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার অধিকারসমূহ আদায় করতে থাকা এবং তাতে অটল-অবিচল থাকা। আর তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর ওপর ভরসা করো। তিনি কতই-না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক, কতই-না উত্তম সাহায্যকারী!

৩. স্বামীকে আনন্দিত রাখার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা, যতক্ষণ না তা হারাম হয়

প্রিয় বোন

দাম্পত্য আচার-আচরণ হলো একটি শাস্ত্র। আর যে নারী জানে, কীভাবে স্বামীকে প্রফুল্ল রাখতে হবে এবং কীভাবে নিজ সৌভাগ্য ও দাম্পত্য সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে, সে হলো এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার অধিকারিণী।

আর স্বামীকে প্রফুল্ল রাখার একটি উপায় হলো, সে যখন ঘরে ফিরে আসবে, তখন যেন স্ত্রীকে সে সর্বোত্তম রূপ ও সজ্জায় দেখতে পায়। এভাবে সে স্বামীকে স্বাগত জানাবে, তার দুশ্চিন্তা প্রশমিত করবে এবং সমস্যা দূর করবে।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, বহু নারী এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে! এমনকি নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাকে স্বামীর সামনে উপস্থিত হয়। ফলে স্বামী তার দিকে দৃষ্টি

দেওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তার অন্তর থেকে হাস্যরসিকতার মানসিকতা উধাও হয়ে যায়। অনেক সময় সে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর উপস্থিতির প্রতি উদাসীন থেকে পাকঘরের কাজ বা ধোয়ামোছার কাজে কিংবা সন্তানদের ঝগড়া নিষ্পত্তির কাজে লিপ্ত থাকে।

বেচারা স্বামী কী করবে? সে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোহর রূপ ও সজ্জায় ভিননারীদের দেখতে পায়। তখন সে তোমাকে তাদের সঙ্গে তুলনা করে এবং শুরু হয় তার মনে বিরাগ ও বিকর্ষণের পালা। তখন সে মনের রাগ ও বিরাগ প্রকাশার্থে স্ত্রীর নিকট ভীষণ অপছন্দনীয় একমাত্র বাক্যটি উচ্চারণ করতে শুরু করে এবং 'যদি বাইরে যাও, তাহলে তুমি তালাক', 'তোমাকে তালাক দেওয়া আমার জন্য জরুরি', 'তুমি আমার জন্য হারাম' ইত্যাদি বাক্যের বাণ তার কানে বিদ্ধ হতে থাকে।

স্বামীর এ পরিবর্তনে স্ত্রীর আচরণেও আসে পরিবর্তন। শয়তান তাকে নিয়ে খেলতে শুরু করে এবং তার মুখ থেকে বের করতে থাকে, 'সে কে?' 'কখন তার কাছে গিয়েছিলে?' 'কীভাবে?' 'কেন?'

এক আচরণ জন্ম দেয় আরেকটা আচরণের, আর এক অবস্থা নিয়ে আসে আরেকটা অবস্থা। এভাবে পরিস্থিতি মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকে। পরিস্থিতির এ চাকার ওপরই তখন দাম্পত্য জীবন ঘুরতে থাকে।

না, হে প্রিয় বোন

তোমার ঘর তুমি করে তোলো স্বামীর শান্তির ঘর, তার সুখের ঠিকানা। তার সামনে তুমি উপস্থিত হও সুন্দরতম রূপে। অচিরেই এমন কিছু দেখতে পাবে যা তোমাকে বিস্মিত করবে। ইমাম সুয়ুতি (রহ.) তাঁর 'আল-ইযাহ্ ফী ইলমিন নিকাহ' গ্রন্থে বলেন, 'ফুকাহায়ে কেরাম নারীদের ঘরে পূর্ণরূপে সাজসজ্জা অবলম্বন করতে অনেক নসিহত করেছেন। এর উপায় হলো, চুল আঁচড়ানো, চুলে সজ্জা করা এবং স্বামীর সামনে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা যা স্বামীর মনে প্রফুল্লতা আনয়ন করবে।'

৪. সুখে-দুঃখে ধৈর্যের সঙ্গে স্বামীর পাশে থাকা এবং তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য না করা, যা করার ক্ষমতা সে রাখে না

দুনিয়া হলো কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাগার। এখানে যে পরিশ্রম করে, সে লক্ষ্য অর্জন করে এবং যে বীজ বপন করে, সে ফসল লাভ করে। এখানে কষ্টের পরেই আসে স্বস্তি এবং যতবারই দুর্দশা আসে, আল্লাহ চাইলে অচিরেই দূর হয়ে যায়।

কিন্তু বহু নারী এমন আছে, যে তার স্বামীর আর্থিক সংকটে ধৈর্যধারণ করে না; বরং তার কাছে এমন কিছু চায়, যার সামর্থ্য সে রাখে না। তাহলে স্বামী বেচারা কী করবে? সে কি চুরি করবে বা ঘুষ নেওয়া শুরু করবে? স্ত্রী এটা বোঝে না যে, ধৈর্য ঈমানের অঙ্গ। শুধু তাই নয়, ধৈর্যশীলদের আল্লাহ অফুরন্ত ও বেহিসাব প্রতিদান দেবেন। তিনি বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।" (সূরা যুমার, ৩৯ : ১০)

প্রিয় বোন

নারী সাহাবিদের রীতি ছিল, যখন তাঁদের কারও স্বামী ঘর থেকে বের হতো, তিনি স্বামীকে বলতেন, 'হারাম উপার্জন থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবেন। কারণ, ক্ষুধা লাগলে আমরা তা সহ্য করতে পারব; কিন্তু জাহান্নামের আগুন আমরা সহ্য করতে পারব না।' কাজেই তুমি এমন স্ত্রী হও, যে বিপদের বিরুদ্ধে স্বামীকে শক্তি জোগায়; স্বামীর বিরুদ্ধে বিপদকে শক্তি জোগায় না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি ভালো করে মনে রেখো : 'আদমসন্তানের সৌভাগ্যের উপকরণ তিনটি, আর দুর্ভাগ্যের উপকরণও তিনটি। সৌভাগ্যেরগুলো : সতী নারী, উত্তম বাসস্থান ও উত্তম বাহন। আর দুর্ভাগ্যেরগুলো : অসতী নারী, নিকৃষ্ট বাসস্থান, নিকৃষ্ট বাহন।'[১]

আমি এখানে স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই চারটি অধিকার বর্ণনা করেই ক্ষান্ত করলাম।

---

১. আহমাদ। এর সনদ সহিহ।

আচ্ছা, এখানে আমি একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করতে চাই।

প্রশ্ন : স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য না করে এবং তার অধিকার আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে কী করণীয়?

উত্তর : এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যা করণীয় তা আল্লাহর ভাষায় :

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান, সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

এই হলো স্ত্রীর অবাধ্যতার কুরআনি চিকিৎসা। যদি সে স্বামীর আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে এবং তার অধিকারাদি আদায় হতে বিরত থাকে এবং বিনা ওজরেই তার অবাধ্য হয়, অর্থাৎ তাকে দুর্বল ও অবসন্ন করে দেওয়ার মতো ওজর-যেমন : হায়েজ[১] , কঠিন পীড়া, নিদারুণ দুঃখ ইত্যাদি-ব্যতীতই অবাধ্য হয়, তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হলো, সে স্ত্রীর এ অবাধ্যতার পেছনে ওজর তালাশ করবে এবং সেগুলোকে বিবেচনায় রাখবে। অতঃপর কুরআনি চিকিৎসার প্রথম স্তর দিয়ে অবাধ্যতার প্রতিকারে সচেষ্ট হবে। যেমন : স্বামীর আনুগত্যকারিণী স্ত্রীর জন্য আল্লাহ যে বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা স্ত্রীকে স্মরণ করাবে এবং অবাধ্যতার কুপরিণতি ও ভয়াবহতা, আল্লাহর আজাব ও জাহান্নামের কথাও স্মরণ করাবে। এর জন্য তাকে বেছে নিতে হবে উপযুক্ত সময় ও সুন্দর বক্তব্য। কিন্তু এতে যদি উপকার না হয়, বরং অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো তাকে শয্যায় বর্জন করা। যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে। আর শয্যায় বর্জন করার তাৎপর্য সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, 'তার সঙ্গে

১. শীঘ্রই দাম্পত্য আচার-বিষয়ক হাদিসের আলোচনায় আমরা নারীর ওপর হায়েজের দৈহিক ও মানসিক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। যে প্রভাব নারীকে স্বামীর আনুগত্যে কিছুটা অক্ষম করে দেয়।

সহযাপন করবে না। ফলে এটা তাকে কষ্টে ফেলে দেবে এবং অন্যায়ের যে তরবারিটা সে সর্বদা স্বামীর বিরুদ্ধে উঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তা বিনাশ করে দেবে।'

তা ছাড়া স্বামীর জন্য তার সঙ্গে কথা বর্জন করারও অবকাশ আছে, তবে তিন দিনের অধিক নয়। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করেছেন। এতেও যদি উপকার না হয়, তাহলে তার কর্তব্য হলো চিকিৎসার শেষ স্তর প্রয়োগ করা। তা হলো এমন প্রহার যা প্রচণ্ড নয়, যা হাড় ভেঙে দেয় না, পেশিকে রক্তাক্ত করে না। যেসকল স্থানে প্রহার করলে তার ক্ষতি হবে, সেসকল স্থানে প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং চেহারায় আঘাত করা যাবে না।

কিন্তু যদি বিরুদ্ধাচরণ স্বামীর দিক থেকেই আসে এবং তার অধিকার আদায়ে স্ত্রীর দিক হতে যদি চেষ্টার কোনো ত্রুটি না থাকে? এমতাবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য কী?

উত্তর : স্ত্রী যদি আশঙ্কা করে বার্ধক্য, বন্ধ্যত্ব বা অন্য কোনো কারণে স্বামী তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, কিন্তু সে তাকে স্বামী হিসাবে রাখতে চায় এবং বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে সে এ ক্ষেত্রে নিজের কিছু অধিকার যেমন : ব্যয় ও বাসস্থান ইত্যাদির দাবি থেকে সরে আসতে পারে-যাতে স্বামী তাকে তালাক না দেয়।
আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো গোনাহ নেই এবং আপস-নিষ্পত্তিই উত্তম। মানুষ লোভের কারণে স্বভাবত কৃপণ। আর যদি তোমরা সৎকর্ম করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (সূরা নিসা, ৪ : ১২৮)

হ্যাঁ, স্বামীর অধিকার আদায়ে কার্পণ্য না করা সত্ত্বেও যদি সে স্ত্রীর বিরোধিতা করতে থাকে, তাকে প্রহার করা, কষ্ট দেওয়া ও মানুষের সামনে অপমানিত করার ধারা চালিয়ে যায় এবং এ কারণে স্ত্রী তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে

স্বামীর কাছে খোলা তালাক চাইতে পারে। আর সেটা হতে হয় মোহরানার হক আদায় সহকারে।

খোলা তালাক হোক বা নিরেট তালাক হোক, প্রথমে তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তির চেষ্টা করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"তোমরা যদি তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করো, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন ও স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুক‚ল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।" (সূরা নিসা, ৪ : ৩৫)

সপ্তম অধ্যায়

দাম্পত্য আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু জরুরি উপদেশ

প্রিয় মুসলিম ভাই, প্রিয় মুসলিম বোন

এখন দাম্পত্য জীবনের আচার-আচরণ সম্পর্কে এমন কিছু জরুরি উপদেশ আলোচনা করা হবে, যা মেনে চললে দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হবে এবং ঝগড়াবিবাদ, হুমকিধমকি ও তালাকের মাধ্যমে টানাহেঁচড়া থেকে মুক্ত থাকবে। আমরা এ আলাচনায় কপট ধার্মিকতা, মেকি লজ্জা এবং জাল ও জয়িফ হাদিস থেকে দূরত্ব অবলম্বন করব এবং কুরআনও সুন্নাহর শিক্ষা ও আলেম-উলামার বাণীর ওপর নির্ভর করব। আল্লাহই সাহায্যদাতা।

১. সত্যিকারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ইসলাম ধর্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেন? কারণ, যেকোনো নোংরা বস্তুর প্রতি অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। দাম্পত্য জীবনকে সফল ও স্থায়ী করার ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভ,মিকা ও প্রভাব সর্বাধিক। সকল স্বামী ও স্ত্রীকে আমি এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি :

মুখ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা

মুখের দুর্গন্ধ মানুষের মনে ভীষণ ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীর কারও মধ্যে এটা থাকলে অপরজন তার কাছে আসতে চায় না-চুম্বন, আলিঙ্গন ও ক্রীড়াকৌতুক করা দূরে থাক। এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের পরিচ্ছন্নতার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। বলেছেন, 'উম্মতের কষ্টের আশঙ্কা না হলে আমি তাদের প্রত্যেক নামাজের সময় মেসওয়াকের আদেশ দিতাম।'[১]

অন্য হাদিসে এসেছে, 'মেসওয়াক হলো মুখের পরিচ্ছন্নতা লাভের উপায় ও রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।' [২]

মেসওয়াক বা টুথপেস্টের মাধ্যমে দাঁতের যত্ন নেওয়া স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্যই অবশ্যকর্তব্য। কারণ, দাঁত ও মাড়ির পচন ও দুর্গন্ধই হচ্ছে দৈহিক ও জৈবিক সম্পর্কের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। কেননা, তা অন্তরের উদ্যম ও আকর্ষণকে নষ্ট করে দেয়।

১. বুখারী। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।
২. নাসাই। এর সনদ সহিহ।

পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য

স্বামী সাধারণত এটাই কামনা করে যে, স্ত্রী তার সামনে সাজসজ্জা অবলম্বন করুক এবং নিজেকে সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখুক। স্ত্রী তার স্বামীর পছন্দের উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে চিত্তাকর্ষক ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করে থাকলে তা স্বামীর মনে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা আনয়ন করে। স্ত্রীও স্বামীর ব্যাপারে এমনটিই কামনা করে। স্ত্রীকে যেমন দেখতে স্বামী অপছন্দ করে, স্বামীকেও তেমন দেখতে স্ত্রী অপছন্দ করে। কিন্তু স্বামী তা ভুলে থাকে বা ভোলার ভান করে। দেখা যায়, সে নোংরা পোশাক পরে আছে। মুখ থেকে সিগারেটের দুর্গন্ধ আসছে। চুল-দাড়ি এলোমেলো। যেন সে একটা শয়তান আর কী! চুল ও দাড়িকে বিন্যস্ত করা, তাতে তেল লাগানো ও দেহে সুগন্ধি ব্যবহারের কোনো আগ্রহ সে অনুভব করে না! এই হলো নিজের অবস্থা, অথচ স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ, 'আমার ভাগ্য মন্দ। আমার স্ত্রী পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন থাকে না।'

হে স্বামী, তুমি জেনে রাখো, তোমার স্ত্রীকে তুমি যেমন দেখতে পছন্দ করো, সেও তোমাকে তেমনই দেখতে পছন্দ করে। আর তাকে যেমন দেখতে তুমি অপছন্দ করো, সেও তোমাকে তেমন দেখতে অপছন্দ করে। মন তো তারও আছে। আবেগের দোলা তো তার মনেও লাগে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) কী সুন্দর বলতেন, 'আমি যেমন এটা পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজসজ্জা করুক; সেও তেমনি এটা পছন্দ করে যে, তার জন্য আমি সাজসজ্জা করি।'

স্ত্রীর উচিত, সে যেন পাকঘর ও ধোয়ামোছার কাজের পর সরাসরি স্বামীর সামনে না যায়। আগে পোশাক পরিবর্তন করবে এবং চেহারা-সুরত পরিপাটি করে নেবে, তারপর যাবে। এটা তাদের উভয়ের জন্যই উত্তম।

স্বাস্থ্যের যত্ন ও পরিচর্যা

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীতে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে : 'ফিতরত তথা সুন্নত পাঁচটি। খতনা করা, নাভির নিচের পশম কাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং গোঁফ ছাঁটা।'[১]

১. বুখারী, মুসলিম। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

ক. খতনা

খতনা হলো পুরুষের বিশেষ অঙ্গের অগ্রভাগে বর্তমান চামড়ার আবরণ কেটে ফেলা। যেন তাতে ময়লা জমতে না পারে এবং যেন সে পেশাব হতে ভালোভাবে পবিত্র হতে পারে এবং যেন স্ত্রীগমনের স্বাদ হ্রাস না পায়। পুরুষের জন্য এটি সুন্নত।

আর নারীর খতনা হলো, তার যোনিপথের ওপরের দিকে ফলের বীজ বা মোরগের ঝুঁটির মতো একটি বিশেষ ধরনের চামড়া কেটে ফেলা। কিন্তু আমার জানামতে, নারীর খতনার ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস পাওয়া যায় না। যদি করতেই হয়, তাহলে শর্ত হলো, অঙ্গটিকে নষ্ট না করে ফেলা। কারণ, তা নারীর স্বাদপ্রাপ্তির জন্য সর্বাধিক সহায়ক এবং পুরুষের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

খ. নাভির নিচের পশম কাটা

উদ্দেশ্য হলো, নর ও নারীর প্রজনন-অঙ্গের চারপাশে বিদ্যমান পশম। পশমগুলো এ সংবেদনশীল স্থানে কিছু সমস্যার জন্ম দেয়। এ পশমগুলো কেটে ফেলা জরুরি। 'হায়াতুনাল জিন্সিয়্যাহ' গ্রন্থে এসেছে, 'প্রজনন-অঙ্গের পশম যদি অযত্ন ও অপরিচ্ছন্নতার শিকার হয়, তাহলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। জীবাণু ও পরজীবীরা পশমের গোড়ায় ও আশেপাশে বংশবিস্তার করতে ভালোবাসে। বিশেষ করে নাভির নিচের উকুন খুবই ক্ষতিকর। এই পরজীবী উকুন খুবই ছোট হয়ে থাকে। পশমের গোড়ার কাছে এরা ডিম পাড়ে। অল্প সময় পরেই ডিমগুলো তাদের মায়েদের অনুসরণ করে। অল্প কদিন যেতে না যেতেই মানবদেহের ওই স্থান এসবের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং সেখানে চুলকানির সৃষ্টি হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি চুলকাতে শুরু করে। নখের আঁচড়ে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ত্বক লাল বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তি লক্ষ করলে সেখানে কোনো বিচরণশীল কীট খুঁজে পায় না। পায় শুধু তামাটে বর্ণের ময়লা। দেখতে তিলের মতো। চুলকালে তা নড়ে না। ওই ব্যক্তি তা উঠাতে পারে না। কারণ, দু-সারি পা দ্বারা সেগুলো ত্বকের সাথে সেপ্টে থাকে; ফলে ত্বক থেকে তা বিচ্ছিন্ন করা যায় না।'[১]

এ সমস্যার সমাধান ও প্রতিকার হলো, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত নির্দেশ পালন করা। আর তা হলো পশমগুলো কামিয়ে ফেলা। আল্লাহই সাহায্যের মালিক।

১. হায়াতুনাল জিনসিয়্যাহ, ড. জাবর আল-কাব্বানি।

গ. নখ কাটা

নখ লম্বা হতে দেওয়া একটি অনুচিত কাজ। কারণ, সেখানে ময়লা জমে এবং জীবাণুরা বাস বাঁধে। নারীরা নখ লম্বা করে তাতে নেইলপালিশ দেয়। এটা যে দর্শকদের অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি করে, শুধু তাই নয়; বরং তার নখের নিচে পানি পৌছতেও বাধা সৃষ্টি করে। ফলে নখে নেইলপালিশ থাকা অবস্থায় ওজু বা জানাবতের গোসল করলে তা সহিহ হয় না।

ঘ. বগলের পশম উপড়ানো

বগলের পশম উপড়ে ফেলা চাই। এর কারণ হলো, বগল থেকে ঘামের দুর্গন্ধ ছড়ায়। আর তা উপড়ে বা কামিয়ে ফেলা দাম্পত্য সম্পর্কের স্থায়িত্বে সহায়তা করে।

ঙ. গোঁফ ছাঁটা

গোঁফ ছাঁটাও দেহকে পরিপাটি করার একটি অংশ। বিশেষ করে গোঁফের যে অংশ ঠোঁটের পরিধির বাইরে চলে যায়, তা অবশ্যই কেটে ফেলা চাই। কারণ, তা স্বামীর চুম্বনের প্রতি স্ত্রীর অন্তরে বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া স্বামী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২. স্ত্রীসংসর্গের পূর্বে শৃঙ্গার করা

স্ত্রীসংসর্গের পূর্ববর্তী ক্রীড়াকৌতুক ও শৃঙ্গারকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। হযরত জাবের (রাযি.)-এর হাদিসে এসেছে, 'তিনি এক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'কুমারী বিবাহ করলে না? সে তোমার সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক করত, তুমি তার সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক করতে।"

স্ত্রী কুমারীই হোক বা বিধবাই হোক, তার সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক, শৃঙ্গার, চুম্বন ও আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হওয়া কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। এতে কামরস নিঃসৃত হয়। এটা যেমন স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্খায় পরিতৃপ্তি আনে, তেমনি এটা সংগমকে সহজতর করে এবং স্ত্রীকে ব্যথামুক্ত থাকতে সহায়তা করে। কাজেই হে স্বামী, তুমি স্ত্রীগমনের পূর্বে তোমার ও স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগের জন্য চুম্বন ও কথোপকথন ইত্যাদির দূত নিযুক্ত করো। স্ত্রীর পরিতৃপ্তি লাভের পূর্বেই নিজ কামনা চরিতার্থ করে

তার থেকে পৃথক হয়ে যেয়ো না। এমন হলে সে নিজেকে তোমার কামনা ঢালার পাত্র ছাড়া আর কিছুই ধারণা করতে পারবে না। তোমার সংস্পর্শে সে নিজের নারী হওয়ার সার্থকতা খুঁজে পাবে না। তোমার দৈহিক সংসর্গের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। অবশেষে এই মানসিক অবস্থা তাকে তোমার দৈহিক সংসর্গ থেকে দূরে ঠেলে দেবে। কাজেই হে স্বামী, তুমি তোমার স্ত্রীকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি প্রদানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করো এবং তার ও তোমার ঘনিষ্ঠতাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টায় নিবেদিত হও।

আর জেনে রাখো, স্ত্রীগমনে তোমার জন্য রয়েছে বিরাট পুণ্য ও প্রতিদান। এর দলিল হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী : 'স্ত্রীগমনেও তোমার জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।' এ কথা শুনে সাহাবিরা বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এক ব্যক্তি তার কামনা চরিতার্থ করবে, আর তার জন্য থাকবে প্রতিদান?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, যদি সে তার এ কামনা কোনো হারাম স্থানে প্রয়োগ করত, তাহলে কি তার পাপ হতো না? তেমনি যদি সে একে হালাল স্থানে প্রয়োগ করে, তাহলেও তার জন্য থাকবে প্রতিদান।'[১]

আর স্বামী ও স্ত্রীর উচিত, সংগমের সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়াটি পড়তে কিছুতেই ভুল না করা। দোয়াটি হলো :

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'শুরু করছি আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের তুমি যা দান করছ, তা থেকেও শয়তানকে দূরে রেখো।'

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি এ দোয়াটি পড়া হয় আর তাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান থাকে, তাহলে ওই সন্তানকে শয়তান কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।'[২]

---

১. মুসলিম

২. বুখারী, মুসলিম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

৩. হায়েজের সময় সংগমের বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"মানুষ তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এটা অশুচি। সুতরাং তোমরা হায়েজের সময় স্ত্রীগমন বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীগমন করবে না। তারপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে যাবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাদেরও ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা, ২ : ২২২)

হায়েজের সময় স্ত্রীগমন বড় পাপ। তা ছাড়া এটা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবে ফেলে। এ কারণেই স্ত্রী হায়েজ থেকে উত্তমরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সংগম করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। সংগম ব্যতীত অন্য যেকোনোভাবে স্ত্রী-উপভোগকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি হায়েজ বা নেফাসের সময় স্ত্রীর যোনিপথে সংগমকে হালাল মনে করে, তাহলে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যদি বিস্মৃতির কারণে হালাল মনে করে সংগম করে অথবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বা হায়েজ শুরু হওয়ার ব্যাপারে না জানার কারণে সংগম করে, তাহলে হারাম হবে না, কাফফারাও আসবে না। আর যদি হায়েজের কথা ও হারাম হওয়ার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সংগম করে, তাহলে গোনাহ[১] হবে।'[২]

---

১. এ ক্ষেত্রে তার কর্তব্য হলো, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা-ইস্তিগফার করা। সাথে সাথে নিম্নোক্ত নিয়মে সদকা করা উত্তম হবে :
হায়েজের শুরুর দিকে সহবাস হলে এক দিনার আর শেষ দিকে হলে অর্ধ দিনার সদকা করার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে হায়েজের রক্ত প্রবাহের সময়ে সংগম করে তবে এক দিনার এবং রক্ত না থাকার সময়ে সংগম করে তবে অর্ধ দিনার সদকা প্রদান করতে হবে।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২১৬৬) উল্লেখ্য, দিনারের পরিমাণ বর্তমান হিসেব অনুযায়ী ৪.৩৭৪ গ্রাম পরিমাণ স্বর্ণ। [সম্পাদক]

২. শরহুল মুহাযযাব নববি (রহ.)

এখানে ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখের কারণ হলো, প্রতারণা-শাস্ত্রে উৎকর্ষ সাধনকারী এক শ্রেণির মানুষ হায়েজের সময় সংগম করে এবং দাবি করে, তারা ওষুধ-জাতীয় রোধক ব্যবহারে হায়েজের ক্ষতিকে রোধ করে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম। রোধক ব্যবহার করা হোক বা না হোক, ক্ষতি হবেই। স্বামীর না হলেও স্ত্রীর হবে। আমরা এখানে এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মাদ ওয়াসফির মত উল্লেখ করছি। তিনি 'আল-কুরআনু ওয়াত্তিব' শীর্ষক তাঁর অমূল্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা চাই তাঁর মত উল্লেখের মাধ্যমে হায়েজের সময় সংগমের ঝুঁকি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে। যেন যারা অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে, তারা দলিল জানার পর মৃত্যুবরণ করে এবং যারা আরও বেঁচে থাকবে, তারাও দলিল জেনে বেঁচে থাকে। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

উল্লিখিত চিকিৎসাবিজ্ঞানীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো, 'হায়েজ নারীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলেও এটা তার জন্য নানা কষ্ট বয়ে আনে। এ সময় তার মেজাজ ও মানসিকতায় বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় এবং সে দেহে ব্যথাবেদনা অনুভব করে, বিশেষ করে পিঠে ভীষণ বেদনা অনুভব করে। তা ছাড়া স্বভাবেও একধরনের রুক্ষতা তাকে ভোগ করতে হয়। এ ধরনের অন্যান্য কষ্টেরও সম্মুখীন তাকে হতে হয়। এগুলোকে হায়েজের লক্ষণ সাব্যস্ত করা হয়।'

এরপর তিনি বলেন, 'হায়েজ ও হায়েজের সময় কৃত সংগম হলো জরায়ু-বিকারের সবচেয়ে বড় কারণ। এর কারণে নারী যে শুধু বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়, তা নয়; বরং হায়েজ নারীর সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিসমূহের অন্তর্গত। এ সময় নারীকে অসহনীয় ব্যথা সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া তার দেহের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়, রোগের নতুন নুতন ঝুঁকিপূর্ণ উপসর্গও এর সঙ্গে যোগ হয়। এসব হলো ওই জরায়ু-বিকারের ফল। এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে সম্ভবত জরায়ুর আশপাশের সংক্রমণ।'

স্বামী যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যৌনাঙ্গে ভীষণ জ্বালাযন্ত্রণা দেখা দেয়। এর কারণ হলো, জীবাণু মূত্রনালির ভেতর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। শুধু তাই নয়, মূত্রথলি ও বৃক্কনালিতেও জীবাণু সংক্রমিত হয়। জ্বালাযন্ত্রণা এমনকি কুপার গ্রন্থি, প্রোস্টেট গ্রন্থি, শুক্রাশয়, উপশুক্রাশয় ও অণ্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।'

এতকিছু সত্ত্বেও স্বামীর ধারণা, সে ওষুধ-জাতীয় রোধক ব্যবহারে ক্ষতি থেকে

আত্মরক্ষা করতে পারে। বেশ! বেচারি স্ত্রী কী আর করবে?

এ কি দয়া ও ভালোবাসা, না আত্মতৃপ্তি ও আত্ম-অহমিকা?

৪. হায়েজের সময় স্ত্রীকে সুখভোগে ব্যবহার

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু স্বামী-স্ত্রীকে হায়েজের সময় যেকোনোপ্রকার সুখ-সম্ভোগ করতে নিষেধ করেননি। তিনি বলেছেন, 'সংগম ব্যতীত আর সবকিছু করো।' [১]

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করতেন, স্ত্রী যেন হায়েজের সময় দেহের নিম্নাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে নেয়। তারপর স্বামী তার সঙ্গে শয়ন করবে।' আরেক সময় হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, 'মেলামেশা করবে।'[২]

'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আসির (রহ.) বলেন, 'এখানে মেলামেশার অর্থ হলো স্পর্শ, অর্থাৎ স্ত্রীর ত্বককে স্বামীর ত্বক স্পর্শ করবে। স্বামী তার দেহের মাধ্যমে সংগম ব্যতীত অন্য যেকোনো উপায়ে সুখ ভোগ করতে পারবে।'

'আল-লিকাউ বাইনায যাওজাইন' গ্রন্থে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থার সমর্থনপুষ্ট এ ব্যাখ্যা নরের সাপেক্ষে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করে, যা নারীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি করে। কারণ এর মাধ্যমে নারী এ বাস্তবতা অনুভব ও অনুধাবন করতে পারে যে, স্বামী তাকে শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণার্থেই চায় না; বরং হায়েজের মতো ঘৃণা ও বিরাগ সৃষ্টিকারী অবস্থায়ও স্বামী তার ঘনিষ্ঠতা কামনা করে। আর সত্যি বলতে কী, নারীকে অন্য কোনোকিছু অতটা বেদনাহত ও ভারাক্রান্ত করে না, যতটা করে এই চেতনা যে, শুধু সংগমের উদ্দেশ্যেই তাকে কামনা করা হয় এবং এর চেয়ে বেশি কোনো মূল্য ও মর্যাদা তার নেই।'[৩]

---

১. মুসলিম, আবু দাউদ
২. বুখারী, মুসলিম
৩. আল-লিকাউ বাইনায যাওজাইন, আব্দুল কাদের আহমাদ আতা

আর স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জেনে রাখা উচিত, স্ত্রী হায়েজ থেকে গোসলের[১] মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করার পূর্বে (অর্থাৎ হায়েজ শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর গোসল না করা পর্যন্ত) তার সঙ্গে সংগম করা জায়েজ নয়। ফুকাহায়ে কেরামের অধিকাংশেরই এই মত। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

'তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রীগমন করবে না।'

অর্থাৎ, পবিত্রতা লাভের উপায় অবলম্বন না করা পর্যন্ত স্ত্রীগমন করবে না। আর ওই উপায় হলো গোসল।

৫. স্ত্রীর পায়ুপথে সংগমের বিধান

স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করা জায়েজ নয়। কারণ, তাতে এমনসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যা হায়েজ ও নেফাসের সময়কার সংগমের চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। হ্যাঁ, শস্যক্ষেত্রে পেছন থেকে সংগম করা জায়েজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।" (সুরা বাকারা, ২ : ২২৩)

অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর দিকে মুখ করেও থাকতে পারবে, পিঠ করেও থাকতে পারবে-যদি সংগম ওই পথে হয়, যে পথে সন্তানের জন্ম হয়। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, 'আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কিসে তোমাকে ধ্বংস করল?' তিনি বললেন, 'গতকাল আমি আমার সামানা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম (অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিপথে তার পেছন দিক থেকে সংগম করেছিলাম)।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি

---

১. উল্লেখ্য, হায়েজের সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী পূর্ণ দশ দিন অতিবাহিত হয়ে যদি রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করা ব্যতীত সংগম করা যাবে। আর দশ দিনের ভেতর যদি রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করা অথবা নামাজের কোনো ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়া ব্যতীত সংগম করা জায়েজ হবে না। [সম্পাদক]

পেছন থেকেও আসতে পারো, সামনে থেকেও আসতে পারো। যা করতে হবে তা হলো, হায়েজ ও পায়ুপথ থেকে দূরে থাকা।'[১]

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, 'উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণী فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো)-তে শস্যক্ষেত্রের অর্থ হলো, নারীদেহের শস্যক্ষেত্র। আর সেটা হলো তার যোনিপথ, যাতে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে বীর্য বপন করা হয়। এতে প্রমাণিত হয়, স্ত্রীকে উপুড় করে রেখেও যোনিপথে সংগম করা জায়েজ। আর পায়ুপথ, সেটা তো না কর্ষণক্ষেত্র, না শস্যক্ষেত্র। আর আল্লাহ তাআলার বাণী 'যেভাবে ইচ্ছা' এর অর্থ হলো, যেকোনো উপায়ে ইচ্ছা।

অতএব স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের উপযুক্ত আসন নির্বাচন করা (যেমন : সামনে ফিরে সংগম করবে, নাকি পেছন ফিরে, নাকি অন্য কোনো উপায়ে), তা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। শুধু এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে, স্বামী তার স্ত্রীর হায়েজের সময় ও পায়ুপথে সংগম থেকে বেঁচে থাকবে।

৬. দেহকে অনাবৃতকরণ ও সতরের প্রতি দৃষ্টিপ্রদানের বিধান

কিছু বাতিল হাদিসের কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লজ্জাবোধ করে। এমন দুটি হাদিস হলো :

ক. হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'আমি কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর দেখিনি।'

খ. কেউ যখন স্ত্রীগমন করবে, তখন সে যেন স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। কারণ, তা অন্ধত্বের সৃষ্টি করে।

এরূপ আরও হাদিস আছে, যেগুলোর ওপর শরিয়তের বিধিবিধান নির্ভরশীল নয়।

উল্লিখিত হাদিসদ্বয়ের প্রথমটিকে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বাতিল সাব্যস্ত

---

১. আহমাদ। এর সনদ হাসান।

করেছেন। আর দ্বিতীয়টিকে ইবনুল জাওযি (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসিনে কেরাম জাল আখ্যা দিয়েছেন।

তাই আমরা বলব, সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত অবশ্যই লজ্জার বিষয়, তবে শরিয়তে এমন কিছু নেই, যা সকলের সামনেই সতর উন্মুক্ত করতে নিষেধ করে।

পরম পরিতাপের বিষয় হলো, লোকমুখে এই হাদিসটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, 'তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীগমন করবে, তখন সে যেন সতর ঢেকে রাখে এবং পূর্ণ বিবস্ত্র যেন না হয়ে যায়।'

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (রহ.)-যিনি তাঁর যুগের অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস ছিলেন-বলেন, 'হাদিসটি জইফ'। ইরাকিও এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম নাসাই (রহ.) বলেন, 'হাদিসটি মুনকার।'

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে শরিয়ত জায়েজ সাব্যস্ত করেছে। নাজায়েজ সাব্যস্ত করার মতো কোনো সহিহ হাদিস নেই।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'আমি ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। কখনো তিনি আগে পানি নিতেন। আমি বলতাম, 'আমাকে দিন, আমাকে দিন।' আমরা উভয়ে জানাবতের অবস্থায় ছিলাম।'[১]

'আল-মুগনী' গ্রন্থে ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর জন্য পরস্পরের পূর্ণ শরীর, এমনকি গুপ্তাঙ্গও দেখা ও স্পর্শ করা জায়েজ। আর গুপ্তাঙ্গ উপভোগ করা যেহেতু জায়েজ, সেহেতু অবশিষ্ট দেহের মতো তা-ও দেখা ও স্পর্শ করা জায়েজ।'

সারকথা, সহিহ হাদিসের মাধ্যমে শরিয়ত বিবস্ত্র হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছে। কেউ তা হারাম বলে দাবি করতে চাইলে তার কর্তব্য হলো কুরআন ও সুন্নাহ হতে সহিহ দলিল উপস্থাপন করা। অন্যথায় তার উচিত হবে, সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে এবং মানুষকে কষ্টে না ফেলে।

---

১. বুখারী, মুসলিম

৭. দ্বিতীয়বার সংগম করতে চাইলে ওজু করে নেওয়া এবং সংগমশেষে গোসল করা

একবার সংগম করার পর আবার করতে চাইলে ওজু করে নেওয়া মুস্তাহাব। আবু সাইদ খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ স্ত্রীগমন করার পর আবার করতে চাইলে সে যেন ওজু করে নেয়।''[১]

ওজু করলে দেহ নতুন করে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সংগমের পর গোসল ও নিদ্রা বিলম্বিত করা জায়েজ। কিন্তু নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ওজু করে নেওয়া সুন্নত, যদি মনে হয় যে, ফজরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নামাজ আদায় করার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে সে জাগ্রত হতে সক্ষম হবে।

কিন্তু যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারে, তাহলে নিদ্রার পূর্বেই গোসল করে নেওয়া উত্তম, যাতে নামাজ ছুটে গিয়ে সে গোনাহগার না হয়।

একই রাতে কেউ একাধিকবার সংগম করলে বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সংগম করলে তার জন্য একবার গোসল করা জায়েজ। হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে সংগম করে একবার গোসল করতেন।'[২]

৮. একখণ্ড কাপড় সঙ্গে রাখা

সংগমের সময় একখণ্ড কাপড় সঙ্গে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। স্ত্রী এটা সংগ্রহ করে রাখবে এবং স্বামীকে দেবে, যাতে অবসর হওয়ার পর সে তা দিয়ে আর্দ্রতা মুছে নিতে পারে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'স্ত্রীর উচিত সঙ্গে একটি বস্ত্রখণ্ড রাখা। সংগমশেষে সে এটা স্বামীকে দেবে। সে তা দিয়ে আর্দ্রতা মুছবে। তারপর স্ত্রীও নিজ দেহের আর্দ্রতা মুছবে। পরিহিত পোশাক নাপাক না হলে তাতেই তারা নামাজ পড়তে পারবে।'

---

১. মুসলিম
২. মুসলিম

৯. গোপন কথা প্রকাশ না করা

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য তাদের দাম্পত্য গোপন বিষয়াদি অন্যের নিকট প্রকাশ করা নির্বুদ্ধিতা ও খেয়ানতের পর্যায়ভুক্ত। জরুরি ও শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এসব বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ করা ও তাতে স্বাদ অনুভব করা শয়তানি কাজ। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হবে ওই ব্যক্তি, যে স্ত্রীগমন করার পর তার অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করে দেয়।'[১]

হ্যাঁ, জৈবিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব না হলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা ও প্রয়োজনে অভিযোগ করার জন্য গোপন বিষয়ও প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। শরিয়তসম্মত প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্যও তা প্রকাশ করা যাবে। চিকিৎসক যাতে রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তার কাছে বিষয় খুলে বলার বিকল্প নেই। তাই সেটাও জায়েজ।

সহিহ হাদিসে এসেছে, 'এক নারী নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দাবি করলেন, তার স্বামী তার সঙ্গে সংগম করতে অক্ষম। ওই ব্যক্তি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তাকে চামড়া ধোলাই করার মতো ধোলাই করি।''[২]

অর্থাৎ, পূর্ণ শক্তিতে দীর্ঘক্ষণ সংগম করি।

১০. জানাবতের গোসলের পদ্ধতি

জানাবতের গোসলের পদ্ধতি জানা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য ওয়াজিব। এখানে আমি গোসলের পদ্ধতি সহজ করে বর্ণনা করছি। জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে ফুকাহায়ে কেরামের বাণীসমূহ উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। আল্লাহই সাহায্যকারী।

জানাবতের গোসলের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

ক. নিয়ত করা

শুধু সাধারণ পবিত্রতা বা সাধারণ গোসলের নিয়ত করলে জানাবতের গোসল আদায়

১. মুসলিম

২. বুখারী, মুসলিম

হবে না।[১] এবং এ গোসলের পর নামাজও সহিহ হবে না। হ্যাঁ, যদি বড় অপবিত্রতা অর্থাৎ জানাবত থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে, তাহলে তার গোসলও সহিহ হবে, নামাজও সহিহ হবে। নিয়তের স্থান হলো অন্তর। জবানে নিয়ত করা একেবারেই জায়েজ নয়।[২]

খ. বিসমিল্লাহ পড়া এবং দুই হাত ধোয়া

পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করবে।

গ. গুপ্তাঙ্গ ধোয়া

গুপ্তাঙ্গ ধুয়ে নেবে এবং সেখানে নাপাকি লেগে থাকলে তা-ও ধুয়ে দূর করবে।

ঘ. ওজু করা

জানাবতের গোসলের জন্য নামাজের ওজুর মতো ওজু করতে হবে। গোসলের স্থানে যদি পানি জমে থাকে, তাহলে পা ওজুর সময় না ধুয়ে গোসল শেষ করার পর ধুলেই হবে। আর যদি পানি জমে না থাকে, বরং প্রবাহিত হয়ে চলে যায়, তাহলে ওজুর সময় পা ধোয়ার অবকাশ আছে।

ঙ. মাথা ধোয়া

মাথা ধোয়ার সময় চুলের গোড়া নাড়াচাড়া করবে। অনুরূপভাবে দাড়ির গোড়াও নাড়াচাড়া করবে। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। নারীও এভাবেই মাথা ধোবে। তবে তার চুল যদি বাঁধা বা বেণি করা থাকে, তাহলে তা খোলা জরুরি নয়। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালেই চলবে। হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি মাথার চুল খোঁপা করে রাখি। জানাবতের গোসলের সময় কি তা খুলতে হবে?' তিনি বললেন, 'না, মাথায় তিনবার পানি ঢালাই যথেষ্ট।

১. আমাদের মতে নিয়ত না করলেও গোসল আদায় হয়ে যাবে এবং নামাজও সহিহ হবে। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী নিয়ত করা সুন্নাত; ফরজ-ওয়াজিব কিছু নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রহ.-এর মতে ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে নিয়ত করাও ফরজ। উল্লেখ্য, নিয়ত করার অর্থ হচ্ছে অপবিত্রতা দূর করা কিংবা নামাজ বৈধ হওয়া এ-জাতীয় বিষয় মনস্থ করা। [সম্পাদক]

২. অধিক ন্যায়সংগত কথা হচ্ছে, নিয়তের স্থান অন্তর হলেও জবানে নিয়ত করার দ্বারা অধিক মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের নিয়তে দৃঢ়তা ও পরিপক্বতা আসে। তাই মৌখিক নিয়ত করাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং তা মুস্তাহাব বা উত্তম। হ্যাঁ, মৌখিক নিয়ত করার ক্ষেত্রে শাব্দিক বা উচ্চারণগত ভুল থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। আর কখনো উচ্চারণগত ভুল যদি হয়েও যায়, তবু অন্তরের নিয়ত ঠিক থাকলেই চলবে। [সম্পাদক]

তারপর শরীরে পানি ঢাললেই তুমি পবিত্রতা লাভ করবে।'[১]

একটি বিষয়ে সাবধানতা জরুরি। তা হলো, চুলে যদি এমন কিছু দেওয়া হয় যার কারণে চুলে পানি পৌঁছতে না পারে, তাহলে গোসল হবে না। চুলের গোড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে।

চ. অবশিষ্ট দেহে পানি প্রবাহিত করা

মাথা ধোয়ার পর অবশিষ্ট দেহে পানি প্রবাহিত করবে। আগে ডান পাশে, তারপর বাম পাশে। দেহের ভাঁজ ও সংকীর্ণ স্থানসমূহে পানি পৌঁছানোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে। যেমন : বগল, কানের ভেতর, নাভি, দুই নিতম্বের মধ্যখান, পায়ের আঙুল ইত্যাদি। সমস্ত দেহে পানি পৌঁছেছে বলে ধারণা হলে গোসল হয়ে যাবে। অবশেষে পা ধোবে, যদি পূর্বে ওজুর সময় ধোয়া না হয়ে থাকে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তারপর নামাজের ওজুর মতো করে ওজু করতেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করতেন। পানি পৌঁছে গেলে তিনি মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সারা দেহে পানি ঢালতেন। অতঃপর পা ধুতেন।'[২]

গোসলের সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে :

- নারীর জানাবতের গোসল পুরুষের মতোই। তবে মাথার খোঁপা বা বেণির নিয়ম ভিন্ন।
- হায়েজ ও নেফাসের গোসলের নিয়মও এটিই। আরেকটি বিষয় হলো, তুলা বা অন্য কিছুতে সুগন্ধি মেখে তা রক্তের স্থানে লাগাবে, যাতে স্থানটির দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।
- গোসলের পূর্বে দেহে বা চুলে পানি-রোধী কোনো কিছু ব্যবহার করলে গোসল হবে না।
- সাবান পানি-রোধী নয়। পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে সাবান ও স্পঞ্জ ব্যবহার করা চলে। তারপর তা ব্যতীতই জানাবত থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত

১. মুসলিম
২. বুখারী, মুসলিম

করবে। ফলে যদি শরীরে সাবান ইত্যাদি লেগেও থাকে, তবু গোসল হয়ে যাবে।

উত্তম হলো প্রথমে শুধু পানি ব্যবহার করে জানাবত থেকে পবিত্র হওয়া, তারপর সাবান ব্যবহার করা।

- হায়েজ ও জানাবতের অবস্থায় চুল ও নখ কাটা এবং বাজারে যাওয়া মাকরূহ নয়; বরং জায়েজ।[১] ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'জানাবতের অবস্থায় ওজু না করেও শিঙা লাগানো, নখ কাটা ও মাথা মুণ্ডন করা যাবে।'

- হায়েজের গোসল ও জানাবতের গোসলে পার্থক্য আছে। হায়েজের গোসলের সময় মাথার খোঁপা ও বেণি খোলা ওয়াজিব।[২] আল্লাহই ভালো জানেন।

- জুমা ও ঈদের জন্য এক গোসল যথেষ্ট। একইভাবে জানাবত ও ঈদের জন্যও এক গোসল যথেষ্ট।

- জানাবতের গোসলের সময় ওজু না করে থাকলে ওই গোসলই ওজুর স্থলবর্তী সাব্যস্ত হবে। উলামায়ে কেরামের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ নেই যে, ওজু হচ্ছে গোসলের অধীন।

- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করতে পারবে। আবার উভয়ে এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে একত্রে গোসল করতে পারবে। হযরত আয়েশা (রাযি.) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন। কখনো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে পানি নিতেন, কখনো হযরত আয়েশা (রাযি.) আগে নিতেন। কখনো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. নারীরা ঘর থেকে বের হওয়া একটি স্বতন্ত্র মাসআলা; এর সাথে হায়েজ অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। হায়েজ অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে, মসজিদ প্রবেশ করা, তাওয়াফ করা, কুরআন স্পর্শ করা, তিলাওয়াত করা, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি। শেষোক্তটি বাদ দিয়ে বাকীগুলো জুনুবী পুরুষ-মহিলার জন্যও হারাম। হায়েজ ও জুনুবী অবস্থায় বিধানগত একটি বৈচিত্র্য হচ্ছে, জুনুবী অবস্থায় পানাহার ইত্যাদি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। তাছাড়া বিনা কারণে জানাবাতের গোসল বিলম্ব করা উচিত নয়। দেখুন- আল-মাওসুআ'তুর ফিক্বহিয়্যাহ: ১৬/৪৫ [সম্পাদক]

২. এটি আমাদের মত নয়। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের মতে জানাবত ও হায়েজের গোসলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এটিই শক্তিশালী মত। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, হায়েজের গোসলের পর রক্তের স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। [সম্পাদক]

ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আমাকে দাও', কখনো হযরত আয়েশা (রাযি.) বলতেন, 'আমাকে দাও'।

- শরীর থেকে যদি পানির ফোঁটা পানির পাত্রে পড়ে, তাহলে পানি নাপাক হবে না। ওই পানি দিয়ে গোসল করা যাবে। কারণ, মুসলমানের শরীর পবিত্র। এর দলিল হলো, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তখন জানাবতের অবস্থায়। তিনি আমার হাত ধরে চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকলাম এবং এক জায়গায় বসে পড়লাম। এক ফাঁকে আমি চুপিসারে চলে এলাম। আমি আমার আসবাবপত্রের কাছে এসে গোসল করলাম। তারপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তখন বসে ছিলেন। তিনি বললেন, 'আবু হুরায়রা, তুমি কোথায় ছিলে?' আমি ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, 'সুবহান আল্লাহ! আবু হুরায়রা, মুমিন অপবিত্র হয় না।'"[১]

শেষ কথা

বইটিকে বর্তমান রূপ দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশা করি, এটি প্রতিটি দম্পতির জন্য তাদের পরস্পরের হক ও অধিকার সম্পর্কে জানার ও উন্নত দাম্পত্য আচরণের মাধ্যমে দাম্পত্য সুখ ও সৌভাগ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমার মিনতি, তিনি যেন এ মেহনতটুকু কবুল করে নেন। শুধু তাঁর সন্তুষ্টিই আমার কামনা।

সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলামিনের জন্য। নবিশ্রেষ্ঠ সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম সকলের প্রতি দরুদ ও সালাম।

লেখক
ক্ষমাশীলের ক্ষমার মুখাপেক্ষী
সাইয়েদ মুবারক আবু হেলাল

---

১. বুখারী

সুখী সংসার মানুষের জন্য শান্তির নীড়। সহমর্মিতা, সমবেদনা আর ভালোবাসায় এ নীড় থাকে ভরপুর—আর মতভেদ-অশান্তি যতটা সম্ভব কম থাকে। সুখী সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একদমই সমস্যা থাকে না—এমন নয়; কিছু মতভেদ তো থাকেই। পার্থক্য হলো—কিছু দম্পতি জানেন কীভাবে সামাল দিতে হয়। আর কিছু দম্পতি অজ্ঞতাবশত একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন—সামান্য মতভেদ থেকে বিশাল যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেন। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে কেউ কি জিততে পারে? একসময় দুজনেই হেরে যায় তালাকের কাছে—ভেঙে ভেঙে খানখান হয় একটি পরিবার।

ইসলাম সুখী দাম্পত্য জীবনের পথ দেখিয়েছে। যে দম্পতি ইসলামের শিক্ষার ওপর যত বেশি অবিচল থাকে, তারা তত সুখী জীবনযাপন করে। এই বইতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন থেকে শুরু করে কীভাবে সুখী দাম্পত্য জীবনের শক্ত ভিত গড়ে তোলা যায়, স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ কী কী, কোথা থেকে আসে নানা সমস্যার ঝড়-ঝাপটা, সেসবের মাঝে কীভাবে টিকে থাকতে হয় এবং এগিয়ে যেতে হয়, ইত্যাদি বিষয়াদি।